প্রকাশক—
শরদকান্তি বসু
শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ, বি-এ

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৩৩

কলিকাতা ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

হালখাতা

আজ পয়লা বৈশাখ। নূতন বৎসরের প্রথম দিন অপর দেশের অপর জাতের পক্ষে আনন্দ-উৎসবের দিন। কিন্তু আমরা সেদিন চিনি শুধু হালখাতায়। বছরকার দিনে আমরা গত বৎসরের দেনাপাওনা লাভলোকসানের হিসেব নিকেশ করি, নূতন খাতা খুলি, এবং তার প্রথম পাতায় পুরাণো খাতার জের টেনে আনি।

বৎসরের পর বৎসর যায়, আবার বৎসর আসে, কিন্তু আমাদের নতুন খাতায় কিছু নতুন লাভের কথা থাকে না। আমরা এক হালখাতা থেকে আর এক হালখাতায় শুধু লোক-সানের ঘরটা বাড়িয়ে চলেছি। এ ভাবে আর কিছুদিন চল্‌লে আমাদের জাতকে দেউলে হ'তে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ

নেই। লাভের দিকে শূন্য ও লোকসানের দিকে অঙ্ক ক্রমে বেড়ে যাচ্চে, তবে আমরা ব্যবসা গুটিয়ে নিইনে কেন? কারণ ভবের হাটে দোকানপাট কেউ স্বেচ্ছায় তোলে না, তার উপর আবার আশা আছে। লোকে বলে আশা না ম'লে যায় না।

আমরা স্বজাতি সম্বন্ধে যে একেবারেই উদাসীন, তা নয়। গেল বৎসর, জাতি হিসেবে কায়স্থ বড় কি বৈদ্য বড়, এই নিয়ে একটা তর্ক ওঠে। যেহেতু আমরা অপরের তুলনায় সকল হিসেবেই ছোট, সেইজন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে কে ছোট কে বড়, এ নিয়ে বিবাদবিসম্বাদ করা ছাড়া আর উপায় নেই! নিজেকে বড় বলে' পরিচয় দেবার মায়া আমরা ছাড়্তে পারিনে। কায়স্থ বলেন আমি বড়, বৈদ্য বলেন আমি বড়। শাস্ত্রে যখন নানা মুনির নানা মত, তখন সূক্ষ্ম বিচার করে' এ বিষয়ে ঠিকটা সাব্যস্ত করা প্রায় অসম্ভব। বৈদ্যের ব্যবসায় চিকিৎসা,—প্রাণ-রক্ষা করা। ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় প্রাণবধ করা,—অতএব ক্ষত্রিয় নিঃসন্দেহ বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! সুতরাং বৈদ্য অপেক্ষা বড় হ'তে গেলে ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক, এই মনে করে' জনকতক কায়স্থ-সমাজের দলপতি ক্ষত্রিয় হ্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এ শুভসংবাদ শুনে' আমি একটু বিশেষ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলুম।

কারণ প্রথমতঃ আমি উন্নতির পক্ষপাতী;—কোন লোক-বিশেষ কিম্বা জাতিবিশেষ আপন চেষ্টায় আপনার অবস্থার উন্নতি কর্‌তে উদ্যোগী হয়েছে দেখ্‌লে কিম্বা শুন্‌লে খুসী হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ বাঙ্গলার পক্ষে যখন

হালখাতা

জিনিসটি এতটা নূতন। নূতনের প্রতি মন কার না যায়, অন্ততঃ দু'দণ্ডের জন্যও। অবনতির জন্য কাউকেই আয়াস করতে হয় না। ও একটু ঢিলে দিলে আপ্‌না হ'তেই হয়। জড়পদার্থের প্রধান লক্ষণ নিশ্চেষ্টতা, আর জড়পদার্থের প্রধান ধর্ম্ম অধোগতি— gravitation. সম্প্রতি প্রোফেসর জে, সি, বোস্ শুন্‌তে পাই বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রমাণ করেছেন যে, জড়ে ও জীবে আমাদের ভেদজ্ঞান শুধু ভ্রান্তিমাত্র। সে ভ্রান্তির মূল, আমাদের চর্ম্মচক্ষুর স্থূলদৃষ্টি। তিনি ইলেক্‌ট্রিসিটির আলোকের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, অবস্থা অনুসারে জড়পদার্থের ভাবভঙ্গী ঠিক সজীব পদার্থের অনুরূপ। প্রোফেসর বোস্ নিজে বলেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে এ কিছু নতুন সত্য বা তথ্য নয়, এ সত্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে বহুপূর্ব্বে ধরা পড়েছিল, তাঁদের দিব্যচক্ষু এড়িয়ে যেতে পারেনি; এক কথায় এটা আমাদের খানদানী সত্য। আমি বলি, তার আর সন্দেহ কি? এ সত্যের প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যও আবশ্যক নয়, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছেও যাবার দরকার নেই। আমরা প্রতিদিনের ও সমগ্র জীবনের কাজে নিত্য প্রমাণ দিচ্চি যে, আমাদের দেশে জড়ে ও জীবে কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ যদি কার্য্যতঃ ওর উল্টোটা প্রমাণ করতে উদ্যত হয়, তা হ'লে নূতন জীবনের স্ফূর্ত্তির একটু আভাস পাওয়া যায়।

আমাদের বাঙ্গালী জাতির চিরলজ্জার কথা আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় নেই! এর জন্য আমরা অপর বীরজাতির ধিক্কার,

লাঞ্ছনা, গঞ্জনা চিরকাল নীরবে সহ্য করে' আস্‌ছি। ঘোষ, বোস, মিত্র, দে, দত্ত, গুহ প্রভৃতিরা যে আমাদের এই চিরদিনের লজ্জা দূর, এই চিরদিনের অভাব মোচন কর্‌বার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন, তার জন্য তাঁরা স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতিপ্রিয় লোকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হবার জন্য ঠিক পথটা অবলম্বন করেন নি, কাজেই অকৃতকার্য্য হয়েছেন। তাঁদের প্রথম ভুল, শাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর কর্‌তে যাওয়া। কি ছিলুম সেইটে স্থির কর্‌তে হ'লে, পুরাণো পাঁজিপুঁথি খুলে' বসা আবশ্যক, কিন্তু কি হব তা স্থির কর্‌তে হ'লে ইতিহাসের সাহায্য অনাবশ্যক। ভবিষ্যতের বিষয় অতীত কি সাক্ষী দেবে? বিশেষতঃ বিষয়টা হচ্চে যখন ক্ষত্রিয় হওয়া, তখন গায়ের জোরই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের এমনি অভ্যাস খারাপ হয়েছে যে, আমরা শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে একপদও অগ্রসর হ'তে পারিনে।

পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষ অত্যাচার কর্‌বার জন্য দুটি মারাত্মক জিনিসের সৃষ্টি করেছে, অস্ত্র-শস্ত্র ও শাস্ত্র। আমরা অত্যন্ত নিরীহ, কারও সঙ্গে মুখে ছাড়া ঝগড়া বিবাদ করিনে, যেখানে লড়াই হচ্চে সে পাড়া দিয়ে হাঁটিনে;—এই উপায়ে যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রকে বেবাক্ ফাঁকি দিয়েছি। যা কিছু বাকি আছে ডাক্তারের হাতে। আমরা চিররুগ্ন, সুতরাং ডাক্তারকে ছেড়ে আমরা ঘর কর্‌তে পারিনে,—এই উভয় সঙ্কটে আমরা হোমিও-প্যাথি ও কবিরাজীর শরণাপন্ন হ'য়ে সে অস্ত্র-শস্ত্রেরও সংস্পর্শ

এড়িয়েছি। আমাদের যখন এত বুদ্ধি, তখন শাস্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার পাই, এমন কি কিছু উপায় বা'র করতে পারিনে ?

কিন্তু ক্ষত্রিয় হওয়া কায়স্থের কপালে ঘট্‌ল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একে কায়স্থের দলপতি, তার উপর আবার গোষ্ঠীপতি, সুতরাং তিনি যখন এ ব্যাপারে বিরোধী হলেন, তখন অপর পক্ষ ভয়ে নিরস্ত হলেন। যাঁরা ক্ষত্রিয় হ'তে উদ্যত, তাঁদের ভয় জিনিসটা যে আগে হ'তেই ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক, এ কথা বোঝা উচিত ছিল। ভীরুতা ও ক্ষাত্রধর্ম্ম যে একসঙ্গে থাকতে পারে না, এ কথা বোধ হয় তাঁরা অবগত ছিলেন না। তবে হয়ত মনে করেছিলেন, যখন মূর্খ ব্রাহ্মণে দেশ ছেয়ে গেছে, তখন ভীরু ক্ষত্রিয়ে আপত্তি কি ? জড়পদার্থেরও একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তার কার্য্য হচ্চে চলৎশক্তি রহিত করা। আমাদের সমাজকে যে নাড়ানো যায় না, তার কারণ এই জড়শক্তিই আমাদের সমাজে সর্ব্বজয়ী শক্তি।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ যে কায়স্থসমাজের সংস্কারের উদ্যোগে বাধা দিয়েছেন, শুধু তাই নয়,—তিনি এবার সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজ-সংস্কার-মহাসভার সভাপতির আসন থেকে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হিন্দুসমাজে অনেক দোষ থাকতে পারে, এবং সে দোষ না থাকলে সমাজের উপকার হ'তে পারে, অতএব সমাজসংস্কারের চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য। সমাজের সৃষ্টি ও গঠন হয়েছে অতীতে, সুতরাং তার সংস্কার ও পরিবর্ত্তন হবে ভবিষ্যতে ; বর্ত্তমানের কোনও কর্ত্তব্য নেই, কোনও দায়িত্ব নেই।

সমাজ গড়ে মানুষে, ইচ্ছে কর্‌লে ভাঙ্‌তে পারে মানুষে,—অতএব মানুষে তার সংস্কার কর্‌তে পারে না, সে ভার সময়ের হাতে, অন্ধ প্রকৃতির হাতে। এ মত যে অস্বীকার করে, সে Burke পড়েনি।

আজকাল এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা সমাজের অবস্থা, দেশের অবস্থা, নিজেদের অবস্থা, এই সব বিষয়েই একটু আধটু চিন্তা করে' থাকেন, এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, সাবধানের মার নেই। এঁরা সব জিনিসই ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডাভাবে কর্‌বার পক্ষপাতী। এঁরা রোখ্ করে' সুমুখে এগোতে চান না বলে' কেউ যেন মনে না ভাবেন যে, এঁরা পিছনে ফির্‌তে চান। যেখানে আছি সেখানে থাকাই এঁরা বুদ্ধির কাজ মনে করেন। বরং একটু অগ্রসর হওয়াই এঁরা অনুমোদন করেন,—কিন্তু সে বড় আস্তে, বড় সন্তর্পণে। যে হাড়-বাঙ্গালী ভাব অধিকাংশ লোকের ভিতর অব্যক্তভাবে আছে, এঁরা কেউ কেউ পরিষ্কার সুন্দর ইংরাজীতে তা ব্যক্ত করেন। সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য এই যে, জীবনের গাধাবোট উন্নতির ক্ষীণ স্রোতে ভাসাও, সে একটু একটু করে' অগ্রসর হবে, যদিচ চোখে দেখ্‌তে মনে হবে চল্‌ছে না। কিন্তু খবরদার লগি মেরো না, দাঁড় ফেলো না, গুণ টেনো না, পাল খাটিয়ো না,—শুধু চুপটি করে' হালটি ধ'রে বসে' থেকো। এই মতের নাম হচ্চে বিজ্ঞতা। বিজ্ঞতার আমাদের দেশে বড় আদর, বড় মান্য। গাধাবোট চলে না দেখে লোকে মনে করে, না-জানি তাতে কত অগাধ মাল বোঝাই আছে!

হালখাতা

বিজ্ঞতা জিনিসটা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার একটা ফল মাত্র। এ অবস্থাকে ইংরেজীতে বলে Transition Period, অর্থাৎ এখন আমাদের জাতির বয়ঃসন্ধি উপস্থিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর বয়ঃসন্ধির এই বলে' বর্ণনা করেছেন যে "লখইতে না পার জেঠ কি কনেঠ,"—এ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ চেনা যায় না। কাজেই আমরা কাজে ও কথায় পরিচয় দিই হয় ছেলেমীর, নয় জ্যাঠামীর, না হয় এক সঙ্গে দু'য়ের। এই জ্যাঠাছেলের ভাবটা আমাদের বিশেষ মনঃপূত। ছোট ছেলের দুরন্ত ভাব আমরা মোটেই ভালবাসিনে। তার মুখে পাকা পাকা কথা শোনাই আমাদের পছন্দসই। এই জ্যাঠামীরই ভদ্র নাম বিজ্ঞতা।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় মনে করি, কিন্তু সরাকে ধরা জ্ঞান করা আমাদের কাছে একটা মহৎ জিনিস। কারণ ও মনোভাবটি না থাক্‌লে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। Burke French Revolution-রূপ বিপুল রাজ্য বিপ্লবের সমালোচনাসূত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, সেই মতামত বালবিধবাকে জোর ক'রে বিধবা রাখ্‌বার স্বপক্ষে, ও কৌলিন্যপ্রথা বজায় রাখ্‌বার স্বপক্ষে প্রয়োগ কর্‌লে যে আর পাঁচজনের হাসি পাবে না কেন, তা বুঝ্‌তে পারিনে।

আমাদের সমাজ ও সামাজিক নিয়ম বহুকাল হ'তে চলে' আস্‌ছে, আচারে ব্যবহারে আমরা অভ্যাসের দাস। আমাদের শিক্ষা নূতন, সে শিক্ষায় আমাদের মনের বদল হয়েছে। আমাদের সামাজিক ব্যবহারে ও আমাদের মনের ভাবে মিল

নেই। যাঁরা মনকে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে' বিশ্বাস করেন, তাঁদের সহজেই ইচ্ছা হয় যে ব্যবহার মনের অনুরূপ করে' আনি। অপর পক্ষে যাঁরা দুর্ব্বল, ভীরু ও অক্ষম, অথচ বুদ্ধিমান—তাঁরা চেষ্টা করেন তর্কযুক্তির সাহায্যে মনকে ব্যবহারের অনুরূপ করে' আনি। এই উদ্দেশ্যে যে তর্কযুক্তি খুঁজে' পেতে বা'র করা হয়, তারি নাম বিজ্ঞভাব! আমরা বাঙ্গালীজাতি সহজেই দুর্ব্বল, ভীরু ও অক্ষম, সুতরাং স্বভাবের বলে আমরা না ভেবে চিন্তে বিজ্ঞের পদানত হই,—এই হচ্চে সার কথা।

বৈশাখ, ১৩০৯

কথার কথা

সম্প্রতি বাঙ্গলা ব্যাকরণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্য-সমাজে একটা বড় রকম বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। আমি বৈয়াকরণ নই, হবারও কোন ইচ্ছে নেই। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরী মুসলমানরা ভস্মসাৎ করেছে বলে' সাধারণতঃ লোকে দুঃখ করে' থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক Montaigneএর মনোভাব এই যে, ও ছাই গেছে বাঁচা গেছে! কেন না, সেখানে অভিধান ও ব্যাকরণের এক লক্ষ গ্রন্থ ছিল। 'বাবা! শুধু কথার উপর এত কথা!' আমিও Montaigneএর মতে সায় দিই। যেহেতু আমি ব্যাকরণের কোন ধার ধারিনে, সুতরাং কোন ঋষিঋণমুক্ত হবার জন্য এ বিচারে আমার যোগ দেবার কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু তর্ক জিনিসটা আমাদের দেশে তরল পদার্থ, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে গড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব। তর্কটা সুরু হয়েছিল ব্যাকরণ নিয়ে, এখন মাঝামাঝি অবস্থায় অলঙ্কার শাস্ত্রে এসে পৌঁচেছে, শেষ হবে বোধ হয় বৈরাগ্যে। সে যাই হোক্, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার কর্‌ছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি কর্‌ব, ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে বাঙ্গলা

আমরা সংস্কৃত বাঙ্গলায় অদ্বৈতবাদী হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে। বাঙ্গলায় ফার্সী কথার সংখ্যাও বড় কম নয়, ভাগ্যক্রমে ফার্সীপড়া বাঙ্গালীর সংখ্যা বড় কম। নৈলে সম্ভবতঃ তাঁরা বল্‌তেন বাঙ্গলাকে ফার্সীবহুল করে' তোল। মধ্যে থেকে আমাদের মা সরস্বতী, কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক একবার মনে হয় ও উভয় সঙ্কট ছিল ভাল, কারণ একেবারে পণ্ডিতমণ্ডলীর হাতে পড়ে' মা'র আশু কাশীপ্রাপ্তি হবারই অধিক সম্ভাবনা।

(৩)

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের উৎপত্তি মানুষের অমর হবার ইচ্ছায়। যা কিছু বর্ত্তমান আছে, তার কুলুজি লিখ্‌তে গেলেই, গোড়ার দিক্‌টে গোঁজামিল দিয়ে সার্‌তে হয়। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, যথা শঙ্কর Spencer প্রভৃতিও ঐ উপায় অবলম্বন করেছেন। সুতরাং কোনও জিনিসের উৎপত্তির মূল নির্ণয় কর্‌তে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম। কিন্তু এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আর যা হ'তেই হোক্‌, অমর হবার ইচ্ছে থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয়নি। প্রথমতঃ অমরত্বের ঝুঁকি আমরা সকলে সাম্‌লাতে পারিনে, কিন্তু কলম চালাবার জন্য আমাদের অনেকেরই আঙ্গুল নিস্‌পিস্‌ করে। যদি ভাল মন্দ মাঝারি আমাদের প্রতি কথা, প্রতি কাজ চিরস্থায়ী হবার তিলমাত্র

সম্ভাবনা থাকৃত, তাহ'লে মনে করে' দেখুন ত আমরা ক'জনে মুখ খুল্‌তে কিম্বা হাত তুল্‌তে সাহসী হতুম? অমরত্বের বিভীষিকা চোখের উপর থাক্‌লে, আমরা যা perfect তা ব্যতীত কিছু বল্‌তে কিম্বা কর্‌তে রাজি হতুম না। আর আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, আমাদের অতি ভাল কাজ, অতি ভাল কথাও perfectionএর অনেক নীচে। আসল কথা, মৃত্যু আছে বলে' বেঁচে সুখ। পুণ্যক্ষয় হবার পর আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা আছে বলে'ই দেবতারা অমরপুরীতে স্ফূর্ত্তিতে বাস করেন, তা নাহ'লে স্বর্গও তাঁদের অসহ্য হ'ত। সে যাই হোক্, আমরা মানুষ, দেবতা নই,—সুতরাং আমাদের মুখের কথা দৈববাণী হবে, এ ইচ্ছা আমাদের মনে স্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কেউ শুধু অমর হবার জন্যে লিখ্‌ব, এই কঠিন পণ করে' বসেন,—তাহ'লে সে ইচ্ছা সফল হবার আশা কত কম বুঝ্‌তে পার্‌লে, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহ'লে লেখা হ'তে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হবেন। কারণ সকলেই জানি যে, হাজারে ন'শ নিরনব্বই জনের সরস্বতী মৃতবৎসা। তা ছাড়া সাহিত্যজগতে মড়ক অষ্টপ্রহর লেগে রয়েচে। লাখে এক বাঁচে, বাদবাকির প্রাণ দু'দণ্ডের জন্যও নয়। চরক পরামর্শ দিয়েছেন, যে দেশে মহামারীর প্রকোপ, সে দেশ ছেড়ে পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। অমর হবার ইচ্ছায় ও আশায়, কে সে রাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে চায়?

বীরবলের হালখাতা

(৪)

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আরও বক্তব্য এই যে, জীয়ন্ত ভাষার ব্যাকরণ কর্‌তে নেই, তাহ'লেই নির্ঘাত মরণ। সংস্কৃত মৃতভাষা, কারণ ব্যাকরণের নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে সংস্কৃত প্রাণত্যাগ করেছে। আরও বক্তব্য এই যে, মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, কিন্তু লিখিত ভাষার ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ—সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ করেছে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা একেবারে চিরকালেব জন্য মরে' গেছে। অর্থাৎ, এক কথায় বল্‌তে গেলে, যে কোন ভাষারই হোক্ না কেন, চিরকালের জন্য বাঁচ্‌তে হ'লে আগে মরা দরকার। তাই যদি হয়, তাহ'লে বাঙ্গলা যদি ব্যাকরণের দড়ি গলায় দিয়ে আত্মহত্যা কর্‌তে চায়, তাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আপত্তি কি? তাঁর মতানুসারে ত যমের দুয়োর দিয়ে অমরপুরীতে ঢুক্‌তে হয়! তিনি আরও বলেন যে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃত সংস্কৃত নয় বলে' পালি প্রভৃতি ভাষা লুপ্ত হ'য়ে গেছে। অতএব, বাঙ্গলা যতটা সংস্কৃতের কাছাকাছি নিয়ে আস্‌তে পারো, ততই তার মঙ্গল। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত সত্য হয়, তাহ'লে সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃত ভাষাতেই ত আমাদের লেখা কর্ত্তব্য। কারণ তাহ'লে অমর হবার বিষয় আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটা কথা আমি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে; পালি প্রভৃতি ভাষা মৃত সত্য, কিন্তু সংস্কৃতও কি মৃত নয়? ও দেবভাষা অমর হ'তে পারে, কিন্তু

ইহলোকে নয়। এ সংসারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াইতে পারে না। পালিও পারে নি, সংস্কৃতও পারে নি, আমাদের মাতৃভাষাও পারবে না। তবে যে ক'দিন বেঁচে আছে, সে ক'দিন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাঙ্গলার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন? বাঙ্গলার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না।

(৫)

এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য যদি ভুল না বুঝে' থাকি, তাহ'লে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গলাকে প্রায় সংস্কৃত করে' আনলে, আসামী হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গভাষা শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্য ভাষার যে সুবিধাটুকু নেই, বাঙ্গলার তা আছে,—যে-কোন সংস্কৃত কথা যেখানে হোক্ লেখায় বসিয়ে দিলে বাঙ্গলা ভাষার বাঙ্গলাত্ব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে, সাধারণ বাঙ্গালীরপক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্ব্বোধ ক'রে তুলতে হবে! কথাটা এতই অদ্ভুত যে, এর কি উত্তর দেবো ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কিনা দেখা যাক্। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের বিশ্বাস যে, বাঙ্গলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলে সংস্কৃত হয়, আর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে, সংস্কৃত কথার অনুস্বর

বিসর্গ ছেঁটে দিলেই বাঙ্গলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়? শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ স্বরূপে বলেছেন, হিন্দীতে 'ঘর্‌মে যায়গা' চলে, কিন্তু 'গৃহমে যায়গা' চলে না,—ওটা ভুল হিন্দী হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় ঘরের বদলে গৃহ যেখানে সেখানে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ সকল ভাষার একটা নিয়ম আছে, শুধু বাঙ্গলা ভাষার নেই। যার যা খুসী লিখ্‌তে পারি, ভাষা বাঙ্গলা হ'তেই বাধ্য। বাঙ্গলা ভাষার প্রধান গুণ যে, বাঙ্গালী কথায় লেখায় যথেচ্ছাচারী হ'তে পারে! শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বাচিত কথা দিয়েই তাঁর ও ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া যায়। 'ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশী করে' খেয়ো', এই বাক্যটি হতে কোথাও 'ঘর' তুলে দিয়ে 'গৃহ' স্থাপনা করে' দেখুন ত কানেই বা কেমন শোনায়, আর মানেই বা কত পরিষ্কার হয়?

(৬)

আসল কথাটা কি এই নয় যে লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নেই? ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখ্‌তে পার্‌লেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা,

ঐক্য নষ্ট করা নয়! ভাষা মানুষের মুখ হ'তে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হ'তে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা কর্‌তে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের ভাবের ঐশ্বর্য্য এতটা বেড়ে গেছে যে বাপ ঠাকুরদাদার ভাষার ভিতর তা আর ধরে' রাখা যায় না। কথাটা ঠিক হ'তে পারে, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কনাদের মতে 'অভাব' একটা পদার্থ। আমি হিন্দুসন্তান, কাজেই আমাকে বৈশেষিক দর্শন মান্‌তে হয়; সেই কারণেই আমি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে, প্রচলিত বাঙ্গলা সাহিত্যেও অনেকটা পদার্থ আছে। ইংরেজী সাহিত্যের ভাব, সংস্কৃত ভাষার শব্দ, ও বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ,—এই তিন চিজ্‌ মিলিয়ে যে খিচুড়ি ত'য়ের করি, তাকেই আমরা বাঙ্গলা সাহিত্য বলে' থাকি। বলা বাহুল্য ইংরেজী না জান্‌লে তার ভাব বোঝা যায় না। আমার এক এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, হয়ত বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা, এই দুয়ের আওতার ভিতর পড়ে' বাঙ্গলা সাহিত্য ফুটে' উঠ্‌তে পার্‌ছে না। এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নূতন কথা আন্‌বার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি কর্‌তে হ'লে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নূতন কথা টেনে আন্‌তে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার কর্‌বেন, তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে'

প্রতি কথাটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে; তা যদি না পারেন তাহ'লে বঙ্গ সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না করে' একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড় কর্‌লেই, ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়্‌বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে' ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বা'র করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটা নিতান্ত না হ'লে নয়, সেটি যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ্‌ খাওয়াতে পারো। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার, কিম্বা চুরি করে' এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আন্‌তে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে' এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯

আমরা ও তোমরা

(১)

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা! তা যদি না হ'ত, তা হ'লে ইউরোপ ও এসিয়া এ দুই, দুই হ'ত না,—এক হ'ত। আমি ও তুমির প্রভেদ থাকৃত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম, না হয় শুধু তোমরা হ'তে।

(২)

আমরা পূর্ব্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানব-সভ্যতার সূতিকা গৃহ, তোমাদের দেশ মানব-সভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হ'তে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

(৩)

আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়; নীল আমাদের শূন্যে, সোনা

আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে' যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হ'লে আমাদের জাত যায়, না হ'লে তোমাদের জাত থাকে না।

(৪)

তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমরা ওজনে ভারি, তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত কর্‌বার তোমাদের মতে একমাত্র উপায়—গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র উপায়—মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাৎ, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে, আছে কি না বোঝা কঠিন। তোমাদের বুদ্ধি স্থূল,—এত স্থূল যে, কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য, তোমাদের কাছে তা কল্পনা,—আর তোমাদের কাছে যা সত্য, আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।

(৫)

তোমরা বিদেশে ছুটে' বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ্। তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছট্‌ফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real. তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় কর্‌বার বল,

আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

(৬)

তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়ো হ'লেও তোমাদের ছেলেমি যায় না,—ছেলেবেলাও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আস্‌তে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হ'লে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।

(৭)

তোমাদের আগে ভালবাসা, পরে বিবাহ,—আমাদের আগে বিবাহ, পরে ভালবাসা। আমাদের বিবাহ 'হয়,' তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু 'ভূ,' তোমাদের ভাষায় 'কৃ'। তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলঙ্কারশাস্ত্রে।

(৮)

অর্থাৎ এক কথায়, তোমরা যা চাও আমরা তা চাইনে, আমরা যা চাই তোমরা তা চাও না,—তোমরা যা পাও আমরা তা পাইনে, আমরা যা পাই তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা একের বদলে পাই শূন্য,

বীরবলের হালখাতা

তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শূন্য। তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ীর বাহিরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ীর ভিতর। আমাদের গান, আমাদের বাজনা তোমাদের মতে শুধু বিলাপ; তোমাদের গান, তোমাদের বাজনা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক। কাজেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যাজ্য। তোমাদের ধর্ম্মমতে আত্মা অনাদি নয় কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্ম্মমতে আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়,—তার শেষ নির্ব্বাণ। পূর্ব্বেই বলেছি প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক। আমরাও ভাল, তোমরাও ভাল,—শুধু তোমাদের ভাল আমাদের মন্দ, ও আমাদের ভাল তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্ত্তমানের তোমরা, এই দু'য়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তা'রা হবে—তাও অসম্ভব।

শ্রাবণ, ১৩০৯

খেয়াল খাতা

(১)

শ্রীমতী ভারতী-সম্পাদিকা নূতন বৎসরের প্রথম দিন হ'তে ভারতীর জন্য একটী খেয়াল খাতা খুল্‌বেন। এই অভিপ্রায়ে যাঁরা লেখেন, কিম্বা লিখ্‌তে পারেন, কিম্বা যাঁদের লেখা উচিত, কিম্বা লিখ্‌তে পারা উচিত,—এমন অনেক লোকের কাছে দু' এক কলম লেখার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। উপরোক্ত চারটি দলের মধ্যে আমি যে ঠিক কোথায় আছি, তা জানিনে। তবুও ভারতী-সম্পাদিকার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বিবেচনায়, দু'চার ছত্র রচনা কর্‌তে উদ্যত হয়েছি। ভারতী-সম্পাদিকা ভরসা দিয়েছেন যে, যা' খুসী লিখ্‌লেই হবে,—কোন বিশেষ বিষয়ের অবতারণা কিম্বা আলোচনা কর্‌বার দরকার নেই। এ প্রস্তাবে অপরের কি হয় বল্‌তে পারিনে, আমার ত ভরসার চাইতে ভয় বেশী হয়। আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, বল্‌বার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ, ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিতশাস্ত্রে যাই হোক্, সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোন কথার গুণবৃদ্ধি করা যায় না। বিনিসূতার মালা ফরমাস দেওয়া যত সহজ, গাঁথা তত সহজ নয়। ও বিদ্যের

সন্ধান শতেকে জনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি। ভারতী-সম্পাদিকার ইচ্ছা এই শেষোক্ত দলের একটু বক্‌বার সুবিধে করে' দেওয়া।

(২)

এ খেয়াল খাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ-চিত্তে যিনি যা' দেবেন, তা' সাদরে গ্রহণ করা হবে। আধুলি সিকি দুয়ানি কিছুই ফেরৎ যাবে না, শুধু ঘসা পয়সা ও মেকি চল্‌বে না। কথা যতই ছোট হোক্, খাঁটি হওয়া চাই,—তার উপর চক্‌চকে হ'লে ত কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে' জিনিসটা লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে' যা আর কারো নজরে পড়ে না, সে ভাব এ খেয়াল খাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরাণো চিন্তা, পুরাণো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে,—আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় যখন কোন ফল ধরে না, তখন বাজে কথার ফুলের চাষ কর্‌লে হানি কি? যখন আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্‌বার কোন উপায় কর্‌তে পার্‌ছিনে, তখন দিন থাক্‌তে সখ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। আর এ কথা বলা বাহুল্য, যেখানে কেনা-বেচার কোন সম্বন্ধ নেই,—ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু দান ও গ্রহণের,—সে স্থলে কোন ভদ্রসন্তান মসিজীবী হ'লেও, যে-কথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না কিম্বা ঝুঁটো বলে' জানেন, তা' চালাতে চেষ্টা কর্‌বেন না। আমরা কার্য্য-

জগতে যখন সাচ্চা হ'তে পারিনে, তখন আশা করা যায় কল্পনা-জগতে অলীকতার চর্চ্চা করব না। এই কারণেই বল্‌ছি ঘসা পয়সা ও মেকি চল্‌বে না।

(৩)

খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদ্-খেয়ালী লোকের কিছু কম্‌তি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা করে, তা আয়াসসাধ্য। সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব, অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত চিন্তা কিম্বা ভাব শুধু দু'এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা' আপনি হয়, তা' এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্য্যজনক যে, তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি। এ জগত-সৃষ্টি ভগবানের লীলা বলে'ই এত প্রশস্ত, এবং আমাদের হাতে গড়া জিনিস কষ্টসাধ্য বলে'ই এত সঙ্কীর্ণ। তবে আমাদের সকলেরই মনে বিনা ইচ্ছাতেও যে নানাপ্রকার ভাবনা-চিন্তার উদয় হয়, এ কথা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই। কিন্তু সে ভাবনা-চিন্তার কারণ স্পষ্ট এবং রূপ অস্পষ্ট। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা স্পষ্ট সাংসারিক কারণে আমাদের ভাবনা হয়, কিন্তু সে ভাবনা এতই এলোমেলো যে, অন্যে পরে কা কথা, আমরা নিজেরাই তার থেই খুঁজে' পাইনে। যা নিজে ধর্‌তে পারিনে, তা অন্যের কাছে ধরে' দেওয়া অসম্ভব; যে ভাব আমরা প্রকাশ কর্‌তে পারিনে, তাকে খেয়াল বলা যায় না। খেয়াল

অনির্দ্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সুস্পষ্ট সুসম্বদ্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।

(৪)

খেয়াল অভ্যাস কর্‌বার পূর্ব্বে খেয়ালের রূপনির্ণয় করাটা আবশ্যক, কারণ স্বরূপ জান্‌লে অনধিকারীরা এ বিষয়ের বৃথা চর্চ্চা কর্‌বেন না। আমাদের লিখিত শাস্ত্রে খেয়ালের বড় উদাহরণ পাওয়া যায় না, সুতরাং সঙ্গীতশাস্ত্র হ'তে এর আদর্শ নিতে হবে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, ধ্রুপদের অধীনতা হ'তে মুক্ত হবার বাসনাই খেয়ালের উৎপত্তির কারণ।, ধ্রুপদের ধীর, গম্ভীর, শুদ্ধ, শান্ত রূপ ছাড়াও, পৃথিবীতে ভাবের অন্য অনেক রূপ আছে। বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে মনের সকল স্ফূর্ত্তি, সকল আক্ষেপ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং ধ্রুপদের কড়া শাসনের মধ্যে যার স্থান নেই,—যথা তান, গিট্‌কিরি ইত্যাদি,—তাই নিয়েই খেয়ালের আসল কারবার। কিন্তু খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হ'লেও, যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দ্দানী করুন্ না কেন, তালচ্যুত কিম্বা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই। জড় যেমন চৈতন্যের আধার, দেহ যেমন রূপের আশ্রয়-ভূমি, রাগও তেমনি খেয়ালের অবলম্বন। বর্ণ ও অলঙ্কার বিন্যাসের উদ্দেশ্য রূপ ফুটিয়ে তোলা, লুকিয়ে ফেলা নয়। খেয়ালের চাল ধ্রুপদের মত সরল নয় বলে', মাতালের মত আঁকাবাঁকা নয়,—নর্ত্তকীর মত বিচিত্র। খেয়াল ধ্রুপদের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাক্ না কেন, সুরের বন্ধন ছাড়ায় না; তার

গতি সময়ে সময়ে অতিশয় দ্রুতলঘু হ'লেও, ছন্দঃপতন হয় না। গানও যে নিয়মাধীন, লেখাও সেই নিয়মাধীন। যাঁর মন সিধে পথ ভিন্ন চল্‌তে জানে না, যাঁর কল্পনা আপনা হ'তেই খেলে না, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারেন না, অথবা ছেড়ে দিলে আর নিজবশে রাখ্‌তে পারেন না,—তাঁর খেয়াল লেখার চেষ্টা না করাই ভাল। তাতে তাঁর শুধু গৌরবের লাঘব হবে। কৃশদেহ পুষ্ট কর্‌বার চেষ্টা অনেক সময়ে ব্যর্থ হ'লেও, কখনই ক্ষতিকর নয়,—কিন্তু স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম কর্‌বার চেষ্টায় প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। ইঙ্গিতজ্ঞ লোকমাত্রেই উপরোক্ত কথা ক'টির সার্থকতা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

(৫)

আমার কথার ভাবেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হাল্কা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুট্‌কিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমী। এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ স্বরূপে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি কিম্বা জাতিবিশেষ যখন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সকল অধিকার হ'তে বিচ্যুত হয়, তখন তার দু'টি অধিকার অবশিষ্ট থাকে,—কাঁদ্‌বার ও হাস্‌বার। আমরা আমাদের সেই কাঁদ্‌বার অধিকার ষোল-আনা বুঝে নিয়েছি, এবং নিত্য কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কাঁদ্‌তে পেলে যত খুসী থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা লেখায় কাঁদি, বক্তৃতায়

কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সন্তুষ্ট থাকিনে, চাঁদা তুলে বিদেশে গিয়ে কাঁদি। আমাদের স্বজাতির মধ্যে যাঁরা স্থানে, অস্থানে, এমন কি অরণ্যে পর্য্যন্ত রোদন করতে শিক্ষা দেন, তাঁরাই দেশের জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান ও প্রধান লোক বলে' গণ্য এবং মান্য। যেখানে ফোঁস্ করা উচিত, সেখানে ফোঁস্ ফোঁস্ করলেই আমরা বলিহারি যাই। আমাদের এই কান্না দেখে কারও মন ভেজে না, অনেকের মন চটে। আমাদের নতুন সভ্যযুগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি ন্যাসন্যাল কংগ্রেস, অপর সদ্যজাত শিশুর মত ভূমিষ্ঠ হ'য়েই কান্না স্থরু করে' দিলেন। আর যদিও তা'র সাবালক হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে, তবুও বৎসরের ৩৬২ দিন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দিয়ে, তারপর জেগে উঠেই তিন দিন ধরে' কোকিয়ে কান্না সমান চল্‌ছে। যদি কেউ বলে, ছি! অত কাঁদ কেন, একটু কাজ কর না,—তা হ'লে তার উপর আবার চোখ রাঙিয়ে ওঠে। বয়সের গুণে শুধু ঐটুকু উন্নতি হয়েছে। মনের দুঃখের কান্নাও অতিরিক্ত হ'লে কারও মায়া হয় না। কিন্তু কান্না ব্যাপারটাকে একটা কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে' তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে। আমরা সমস্ত দিন গৃহকর্ম্ম করে', বিকেলে গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, পা ছড়িয়ে যখন পুরাতন মাতৃবিয়োগের জন্য নিয়মিত এক ঘণ্টা ধরে' ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকি, তখন পৃথিবীর পুরুষমানুষদের হাসিও পায়, রাগও ধরে। সকলেই জানেন যে, কান্না ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে,—যথা, রোল কান্না, মড়া কান্না, ফুঁপিয়ে কান্না, ফুলে ফুলে কান্না ইত্যাদি,—

কিন্তু আমরা শুধু অভ্যাস করেছি নাকে কান্না! এবং এ কথাও বোধ হয় সকলেই জানেন যে, সদারঙ্গ বলে' গেছেন খেয়ালে সব স্থর লাগে, শুধু নাকি স্থর লাগে না। এই সব কারণেই আমার মতে এখন সাহিত্যের স্থর বদলানো প্রয়োজন। করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁত্‌সেঁতে হ'য়ে উঠেছে; আমাদের স্থখের জন্য না হোক্, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে, আমাদের এই দুর্দ্দিনে হাসি কি শোভা পায়? তার উত্তর—ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতেও কি বিদ্যুৎ দেখা দেয় না, কিম্বা শোভা পায় না? আমাদের এই অবিরত-ধারা অশ্রুবৃষ্টির মধ্যে কেহ কেহ যদি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তা হ'লে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটা সম্ভাবনা হয়।

বৈশাখ, ১৩১২

মলাট-সমালোচনা

'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :—

'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি' জিনিসটা এ দেশে একটা মস্ত ঠাট্টার সামগ্রী। কিন্তু বারো পাতা বইয়ের তেরো পাতা সমালোচনা দেখে কারোই হাসি পায় না। অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কমই হোক্ আর এক হাত বেশীই হোক্, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের কিংবা সমাজের কি ফললাভ হয়, বলা কঠিন। সেকালে যখন সূত্র আকারে মূল গ্রন্থ রচনা কর্‌বার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তখন ভাষ্যে টীকায় কারিকায় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একালে যখন, যে কথা দু' কথায় বলা যায়, তাই দু'শো কথায় লেখা হয়, তখন সমালোচক-দের ভাষ্যকার না হ'য়ে সূত্রকার হওয়াই সঙ্গত। তাঁরা যদি কোন নব্য গ্রন্থের খেই ধরিয়ে দেন, তা হ'লেই আমরা পাঠকবর্গ যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু ঐরূপ কর্‌তে গেলে তাঁদের ব্যবসা মারা যায়। সুতরাং তাঁরা যে সমালোচনার রীতি পরিবর্ত্তন কর্‌বেন, এরূপ আশা করা নিষ্ফল।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যুক্তির প্রতিবাদ করে' একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার ঠিক মনে নেই যে, তিনি সাহিত্যেও অত্যুক্তি যে নিন্দনীয়, এ কথাটা বলেছেন কি না। সে যাই হোক্,

মলাট-সমালোচনা

রবীন্দ্রবাবুর সেই তীব্র প্রতিবাদে বিশেষ কোন সুফল হয়েছে বলে' মনে হয় না। বরং দেখতে পাই যে, অত্যুক্তির মাত্রা ক্রমে সপ্তমে চড়ে' গেছে। সমালোচকদের অত্যুক্তিটা প্রায় প্রশংসা করবার সময়েই দেখা যায়। বোধ হয় তাঁদের বিশ্বাস যে, নিন্দা জিনিসটা সোজা কথাতেই করা চলে, কিন্তু প্রশংসাকে ডালপালা দিয়ে পত্রে পুষ্পে সাজিয়ে বা'র করা উচিত। কেন-না নিন্দুকের চাইতে সমাজে চাটুকারের মর্য্যাদা অনেক বেশী। কিন্তু আসলে অতি-নিন্দা এবং অতি-প্রশংসা উভয়ই সমান জঘন্য। কারণ, অত্যুক্তির 'অতি',—শুধু সুরুচি এবং ভদ্রতা নয়, সত্যেরও সীমা অতিক্রম করে' যায়। এক কথায়, অত্যুক্তি, মিথ্যোক্তি। মিছা কথা মানুষে বিনা কারণে বলে না। হয় ভয়ে, না হয় কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকে সত্যের অপলাপ করে। সম্ভবতঃ অভ্যাসবশতঃ মিথ্যাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকমাত্রায় কেউ চর্চ্চা করে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলা চর্চ্চা করলে, ক্রমে তা উদ্দেশ্যবিহীন অভ্যাসে পরিণত হয়। বাঙ্গলা-সাহিত্যে আজকাল যেরূপ নির্লজ্জ অতি-প্রশংসার বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, তা'তে মনে হয় যে, তার মূলে উদ্দেশ্য এবং অভ্যাস দুই জিনিসই আছে। এক একটি ক্ষুদ্র পুস্তকের যে-সকল বিশেষণে স্তুতিবাদ করা হ'য়ে থাকে, সেগুলি বোধ হয় শেক্সপীয়র কিংবা কালিদাসের সম্বন্ধে প্রয়োগ করলেও একটু বেশী হ'য়ে পড়ে। সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে, যাতে বাজারে

বীরবলের হালখাতা

বইয়ের ভালরকম কাট্‌তি হয়, সেই উদ্দেশ্যে আজকাল সমালোচনা লেখা হ'য়ে থাকে। যে উপায়ে পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রী করা হয়, সেই উপায়েই সাহিত্যও বাজারে বিক্রী করা হয়। লেখক সমালোচক হয় একই ব্যক্তি, নয় পরস্পরে একই কারবারের অংশীদার। আমার মাল তুমি যাচাই করে' পয়লা নম্বরের বলে' দাও, তোমার মাল আমি যাচাই করে' পয়লা নম্বরের বলে' দেবো,—এই রকম একটা বন্দোবস্ত পেশাদার লেখকদের মধ্যে যে আছে, এ কথা সহজেই মনে উদয় হয়। এই কারণেই, পেটেণ্ট ঔষধের মতই, একালের ছোট গল্প কিংবা ছোট কবিতার বই,—মেধা, হ্রী, ধী, শ্রী প্রভৃতির বর্দ্ধক, এবং নৈতিক-বলকারক বলে'—উল্লিখিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে' পাঠক নিত্যই প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হয়। যা' চ্যবন-প্রাশ বলে' কিনে আনা যায়, তা দেখা যায়,—প্রায়ই অকাল-কুষ্মাণ্ডখণ্ডমাত্র।

অতি বিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম। কারণ, মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার উপর বিজ্ঞাপনের বল, এবং মানবমনের সরল বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞাপনের ছল প্রতিষ্ঠিত। যখন আমাদের এক মাথা চুল থাকে, তখন আমরা কেশ-বর্দ্ধক তৈলের বড় একটা সন্ধান রাখিনে। কিন্তু মাথায় যখন টাক চক্‌ চক্‌ করে' ওঠে, তখনই আমরা কুন্তলবৃষ্যের শরণ গ্রহণ করে' নিজেদের অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় পাই, এবং দিই। কারণ, তাতে টাকের প্রসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, এবং

সেই সঙ্গে টাকাও নষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের মন ও নয়ন আকর্ষণ করা। বিজ্ঞাপন প্রতি ছত্রের শেষে প্রশ্ন করে,—'মনোযোগ কর্‌ছেন ত?' আমাদের চিত্ত আকর্ষণ কর্‌তে না পার্‌লেও, বিজ্ঞাপন চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের নয়ন আকর্ষণ করে' থাকে। ও জিনিস চোখ এড়িয়ে যাবার জো নেই। কারণ, এ যুগে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রবন্ধের গা ঘেঁসে থাকে, মাসিক পত্রিকার শিরোভূষণ হ'য়ে দেখা দেয়, এক কথায় সাহিত্য-জগতে যেখানেই একটু ফাঁক দেখে, সেইখানেই এসে জুড়ে' বসে। ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবচন আছে যে, প্রাচীরের কান আছে। এদেশে সে বধির কি না জানিনে, কিন্তু বিজ্ঞা-পনের দৌলতে মূক নয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের প্রাচীর মিথ্যা কথা তারস্বরে চীৎকার করে' বলে। তাই আজকাল পৃথিবীতে চোখকান না বুজে চল্‌লে, বিজ্ঞাপন কারো ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে না। যদি চোখকান বুজে চল, তা হ'লেও বিজ্ঞাপনের হাত থেকে নিস্তার নেই। কারণ, পদব্রজেই চল, আর গাড়ীতেই যাও, রাস্তার লোকে তোমাকে বিজ্ঞাপন ছুঁড়ে' মারে। এতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কথা নেই। ছুঁড়ে' মারাই বিজ্ঞাপনের ধর্ম্ম। তার রং ছুঁড়ে' মারে, তার ভাষা ছুঁড়ে' মারে, তার ভাব ছুঁড়ে' মারে। সুতরাং বিজ্ঞাপিত জিনিসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা না থাক্‌লেও, তার মোড়কের সঙ্গে এবং মলাটের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। আমি বহু ঔষধের এবং বহু গ্রন্থের কেবলমাত্র মুখ চিনি ও নাম জানি।

যা জানি, তারই সমালোচনা করা সম্ভব। সুতরাং আমি মলাটের সমালোচনা করতে উদ্যত হয়েছি। অন্ততঃ মুখপাত-টুকু দোরস্ত করে' দিতে পারলে, আপাততঃ বঙ্গ-সাহিত্যের মুখ-রক্ষা হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের কেবলমাত্র নাম-রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। প্রধানতঃ সেই নাম জিনিসটার সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপ জিনিসটা একেবারে ছেঁটে দেওয়া চলে না বলে', সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলতে চাই। ডাক্তারখানার আলো যেমন লাল নীল সবুজ বেগুনে প্রভৃতি নানারূপ কাঁচের আবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তেমনই পুস্তকের দোকানে এ কালের পুস্তক পুস্তিকাগুলি নানারূপ বর্ণচ্ছটায় নিজেদের প্রকাশ করে। সুতরাং নব্য সাহিত্যের বর্ণপরিচয় যে আমার হয়নি, এ কথা বলতে পারিনে। কবিতা আজকাল গোধূলিতে গা-ঢাকা দিয়ে, 'লজ্জা-নম্র নববধূ সম' আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না। কিন্তু গালে আলতা মেখে রাজপথের সুমুখে বাতায়নে এসে দেখা দেয়। বর্ণেরও একটা আভিজাত্য আছে। তার সুসংযত ভাবের উপরেই তার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। বাড়া-বাড়ি জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার পরিচায়ক। আমার মতে, পূজার বাজারের নানারূপ রঙ্চঙে পোষাক পরে' প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্যের সমাজে বা'র হওয়া উচিত নয়। তবে পূজার উপহার স্বরূপে যদি তার চলন হয়, তা হ'লে অবশ্য কিছু বলা চলে না।

মলাট-সমালোচনা

সাহিত্য যখন কুন্তলীন, তাম্বুলীন এবং তরল আল্‌তার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হয়, তখন পুরুষের পক্ষে পরুষ বাক্য ছাড়া তার সম্বন্ধে অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা চলে না। তবে এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে, এতে যে আত্মমর্য্যাদার লাঘব হয়, এ সহজ কথাটা কি গ্রন্থকারেরা বুঝ্‌তে পারেন না? কবি কি চান যে, তাঁর হৃদয়রক্ত তরল আল্‌তার সামিল হয়? চিন্তাশীল লেখক কি এই কথা মনে করে' সুখী হন যে, তাঁর মস্তিষ্ক লোকে সুবাসিত নারিকেল তৈল হিসাবে দেখ্‌বে? এবং বাণী কি রসনা-নিঃসৃত পানের পিকের সঙ্গে জড়িত হ'তে লজ্জা বোধ করেন না? আশা করি যে, বইয়ের মলাটের এই অতিরঞ্জিত রূপ শীঘ্রই সকলের পক্ষেই অরুচিকর হ'য়ে উঠ্‌বে। অ্যান্টীক কাগজে ছাপানো, এবং চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে করে' বাঁধানো পুস্তকে আমার কোন আপত্তি নেই। দপ্তরীকে আসল গ্রন্থকার বলে' ভুল না কর্‌লেই আমি খুসী হই। আমরা যেন ভুলে' না যাই যে, লেখকের কৃতিত্ব মলাটে শুধু ঢাকা পড়ে। জীর্ণ কাগজে, শীর্ণ অক্ষরে, ক্ষীণ কালীতে ছাপানো একখানি 'পদ কল্পতরু' যে শত শত তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে গ্রন্থের চাইতে শতগুণে আদরের সামগ্রী!

এখন সমালোচনা সুরু করে' দেবার পূর্ব্বেই কথাটার একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ, ঐ শব্দটি আমরা ঠিক অর্থে ব্যবহার করি কি না, সে বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। প্রথমেই, 'সম্‌' উপসর্গটির যে বিশেষ কোন সার্থকতা আছে,

এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। শব্দ অতিকায় হ'লে যে তার গৌরব-বৃদ্ধি হয়, এ কথা আমি মানি; কিন্তু, দেহভারের সঙ্গে সঙ্গে যে বাক্যের অর্থভার বেড়ে যায়, তার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ যুগের লেখকেরা মাতৃভাষায় লিখেই সন্তুষ্ট থাকেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে মায়ের দেহপুষ্টি করাও তাঁদের কর্ত্তব্য বলে' মনে করেন। কিন্তু সে পুষ্টিসাধনের জন্য বহুসংখ্যক অর্থপূর্ণ ছোট ছোট কথা চাই, যা সহজেই বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হ'তে পারে। স্বল্পসংখ্যক এবং কতকাংশে নিরর্থক বড় বড় কথার সাহায্যে সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য; কিন্তু সেই স্বল্প পরিচয়েই আমার এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, সে ভাষার বাক্যাবলী আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন। সংস্কৃতের উপর হস্তক্ষেপ কর্‌বা মাত্রই তা আমাদের হস্তগত হয় না। বরং আমাদের অশিক্ষিত হাতে পড়ে' প্রায়ই তার অর্থ-বিকৃতি ঘটে। সংস্কৃত সাহিত্যে গোঁজামিল দেওয়া জিনিসটা একেবারেই প্রচলিত ছিল না। কবি হোন্, দার্শনিক হোন্, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা প্রত্যেক কথাটি ওজন করে' ব্যবহার কর্‌তেন। শব্দের কোনরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ সেকালে অমার্জ্জনীয় দোষ বলে' গণ্য হ'ত। কিন্তু একালে আমরা কথার সংখ্যা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওজনের ধার বড় একটা ধারিনে। নিজের ভাষাই যখন আমরা সূক্ষ্ম অর্থ বিচার করে' ব্যবহার করিনে, তখন স্বল্প-পরিচিত এবং অনায়ত্ত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করে' ব্যবহার কর্‌তে গেলে,

সে ব্যবহার যে বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তা আমি জানি। তবুও একেবারে বেপরোয়াভাবে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তা'তে মনোভাবও স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করা যায় না, এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। উদাহরণ-স্বরূপে দেখানো যেতে পারে, এই 'সমালোচনা' কথাটা আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি, তার আসল অর্থ ঠিক তা নয়। আমরা কথায় বলি 'লেখাপড়া' শিখি; কিন্তু আসলে আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শুধু পড়্‌তেই শিখি, লিখ্‌তে শিখিনে। পাঠক-মাত্রেরই পাঠ্য কিম্বা অপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে মতামত গড়ে' তোল্‌বার ক্ষমতা থাক্ আর না থাক্, মতামত ব্যক্ত কর্‌বার অধিকার আছে; বিশেষতঃ সে কার্য্যের উদ্দেশ্য যখন আর পাঁচ জনকে বই পড়ানো, লেখানো নয়। সুতরাং সমালোচিতব্য বিষয়ের বাঙ্গলা-সাহিত্যে অভাব থাক্‌লেও, সমালোচনার কোন অভাব নেই। এই সমালোচনা-বন্যার ভিতর থেকে একখানি-মাত্র বই উপরে ভেসে উঠেছে। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলোচনা'। তিনি যদি উক্ত নামের পরিবর্ত্তে তার 'সমালোচনা' নাম দিতেন, তা হ'লে আমার বিশ্বাস, বৃথা বাগাড়ম্বরে 'আলোচনার' ক্ষুদ্র দেহ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে এত গুরুভার হ'য়ে উঠ্‌ত যে, উক্ত শ্রেণীর আর পাঁচখানা বইয়ের মত এখানিও বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে যেত। এই দুটি শব্দের মধ্যে যদি একটি রাখ্‌তেই হয়, তা হ'লে 'সম্' বাদ দিয়ে 'আলোচনা' রক্ষা করাই শ্রেয়। যদিচ ও কথাটিকে আমি ইংরেজী criticism

শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বলে' মনে করিনে। আলোচনা মানে 'আ' অর্থাৎ বিশেষরূপে, 'লোচন', অর্থাৎ ঈক্ষণ। যে বিষয়ে সন্দেহ হয়, তার সন্দেহভঞ্জন কর্‌বার জন্য বিশেষরূপে সেটিকে লক্ষ্য করে' দেখ্‌বার নামই আলোচনা। তর্কবিতর্ক, বাক্‌বিতণ্ডা, আন্দোলন আলোড়ন প্রভৃতি অর্থেও ঐ কথাটি আজকালকার বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু ও কথায় তার কোন অর্থ ই বোঝায় না। 'আলোচনা' ইংরাজী scrutinize শব্দের যথার্থ 'প্রতিবাক্য'। Criticism শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বাঙ্গলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় না থাকৃলেও, 'বিচার' শব্দটি অনেক-পরিমাণে সেই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু 'সমালোচনা'র পরিবর্ত্তে 'বিচার' যে বাঙ্গালী সমালোচকদের কাছে গ্রাহ্য হবে, এ আশা আমি রাখিনে। কারণ, এঁদের উদ্দেশ্য বিচার করা নয়, প্রচার করা। তা ছাড়া যে কথাটা একবার সাহিত্যে চলে' গেছে, তাকে অচল কর্‌বার প্রস্তাব অনেকে হয় ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় বলে' মনে কর্‌বেন। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যখন আমরা নির্ব্বিচারে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দকে বঙ্গ-সাহিত্যের কারাগারে প্রবেশ করিয়েছি, এখন আবার সুবিচার করে' তার গুটিকতককে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় অন্যায় কার্য্য হবে না। আর এক কথা। যদি 'criticism' অর্থেই আমরা আলোচনা শব্দ ব্যবহার করি, তা হ'লে 'scrutinize' অর্থে আমরা কি শব্দ ব্যবহার কর্‌ব? সুতরাং, যে উপায়ে আমরা মাতৃভাষার দেহপুষ্টি কর্‌তে চাই, তা'তে ফলে সুধু তার অঙ্গহানি

হয়। শব্দ সম্বন্ধে যদি আমরা একটু শুচি-বাতিকগ্রস্ত হ'তে পারি, তা হ'লে আমার বিশ্বাস, বঙ্গভাষার নির্ম্মলতা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হ'তে পারে। অনাবশ্যকে যদি আমরা সংস্কৃত ভাষার উপর হস্তক্ষেপ কর্‌তে সঙ্কুচিত হই, তা'তে সংস্কৃত ভাষার উপর অবজ্ঞা দেখানো হবে না, বরং তার প্রতি যথার্থ ভক্তিই দেখানো হবে। শব্দগৌরবে সংস্কৃত ভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে' তার ধ্বনিতে মুগ্ধ হ'য়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাঙ্গলা-সাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ কর্‌ব, তা'ও ঠিক নয়। বাণী কেবলমাত্র ধ্বনি নয়। আমি বহুদিন থেকে এই মত প্রচার করে' আস্‌ছি, কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেন না। সাহিত্য জগতে এক শ্রেণীর জীব বিচরণ করে, যাদের প্রাণের চাইতে কান বড়। সঙ্গীতচর্চ্চার লোভ তারা কিছুতেই সংবরণ কর্‌তে পারে না, এবং সে ব্যাপার থেকে তাদের নিরস্ত কর্‌বার ক্ষমতাও কারো নেই। প্রতিবাদ করায় বিশেষ কোন ফল নেই জেনেও, আমি প্রতিবাদ করি; কারণ, আজকালকার মতে, আপত্তি নিশ্চিত অগ্রাহ্য হবে জেনেও, আপত্তি করে' আপত্তিকর জিনিসটি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে' নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলে' বিবেচিত হয়।

এখানে বলে' রাখা আবশ্যক যে, কোন বিশেষ লেখকের বা লেখার প্রতি কটাক্ষ করে' আমি এ সব কথা বল্‌ছিনে। বাঙ্গলা-সাহিত্যের একটা প্রচলিত ধরণ, ফ্যাসান, এবং ঢংএর সম্বন্ধেই আমার আপত্তি, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই আমার

উদ্দেশ্য। সমাজের কোন চল্‌তি স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে যে আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারি, এমন অন্যায় ভরসা আমি রাখিনে। সকল উন্নতির মূলে থামা জিনিসটা বিদ্যমান। এ পৃথিবীতে এমন কোন সিঁড়ি নেই, যার ধাপে ধাপে পা ফেলে আমরা অবলীলাক্রমে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হ'তে পারি। মনোজগতে প্রচলিত পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হ'তে সঙ্কীর্ণতর হ'য়ে শেষে চোরা গলিতে পরিণত হয়, এবং মানুষের গতি আটূকে দেয়। বিজ্ঞানে যাকে evolution বলে, এক কথায় তার পদ্ধতি এই যে, জীব একটা প্রচলিত পথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ এক জায়গায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে, ডাইনে কি বাঁয়ে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করে, এবং সাহস করে' সেই পথে চল্‌তে আরম্ভ করে। এই নূতন পথ বা'র করা, এবং সেই পথ ধরে' চলার উপরেই জীবের জীবন এবং মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। মুক্তির জন্যে, হয় দক্ষিণ নয় বাম মার্গ যে অবলম্বন করতেই হবে, এ কথা এ দেশে ঋষিমুনিরা বহুকাল পূর্ব্বে বলে' গেছেন; অতএব একেলে বিজ্ঞান এবং সেকেলে দর্শন উভয়ই এই শিক্ষা দেয় যে, সিধে পথটাই মৃত্যুর পথ। সুতরাং বাঙ্গলা লেখার প্রচলিত পথটা ছাড়্‌তে পরামর্শ দিয়ে আমি কাউকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করিনে। আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত ছেড়ে যদি আমরা দেশী পথে চল্‌তে শিখি, তা'তে বাঙ্গলা-সাহিত্যের লাভ বই লোকসান নেই। ঐ পথটাই ত স্বাধীনতার পথ, এবং সেই কারণেই উন্নতির পথ,—এই ধারণাটি মনে এসে

যাওয়াতেও আমাদের অনেক উপকার আছে। আমি জানি যে, সাহিত্যে কিংবা ধর্ম্মে একটা নূতন পথ আবিষ্কার কর্‌বার ক্ষমতা কেবলমাত্র দু'চারজন মহাজনেরই থাকে, বাদবাকী আমরা পাঁচজনে সেই মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে' চল্‌তে পার্‌লেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। গড্ডলিকা-প্রবাহ ন্যায়ের অবলম্বন করা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিকও বটে, কর্ত্তব্যও বটে; কেন না, পৃথিবীর সকল ভেড়াই যদি মেড়া হ'য়ে ওঠে ত ঢুঁ-মারামারি করে'ই মেষ-বংশ নির্ব্বংশ হবে! উক্ত কারণেই আমি লিখ্‌বার একটা প্রচলিত ধরণের বিরোধী হ'লেও, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের বিরোধী নই। আমরা কেউ ভাষা জিনিসটা তৈরি করিনে, সকলেই তৈরি ভাষা ব্যবহার করি। ভাষা জিনিসটা কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির মনগড়া নয়, যুগযুগান্তর ধরে' একটি জাতির হাতে গড়া। কেবলমাত্র মনোমত কথা বেছে নেবার, এবং ব্যাকরণের নিয়মরক্ষা করে' সেই বাছাই কথাগুলিকে নিজের পছন্দমত পাশাপাশি সাজিয়ে রাখ্‌বার স্বাধীনতাই আমাদের আছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা জহুরী, তাঁরা এই চল্‌তি কথার মধ্যেই রত্ন আবিষ্কার করেন, এবং শিল্পগুণে গ্রথিত করে' দিব্য হার রচনা করেন। নিজের রচনাশক্তির দারিদ্র্যের চেহারাই আমরা মাতৃভাষার মুখে দেখ্‌তে পাই, এবং রাগ করে' সেই আয়নাখানিকে নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হই, ও পূর্ব্বপুরুষদের সংস্কৃত দর্পণের সাহায্যে মুখরক্ষা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠি। একরকম কাঁচ আছে, যাতে

মুখ মস্ত দেখায়—কিন্তু সেই সঙ্গে চেহারা অপরিচিত বিকটাকার ধারণ করে। আমাদের নিজেকে বড় দেখাতে গিয়ে যে আমরা কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করি, তাতে আমাদের কোন লজ্জাবোধ হয় না। এখানে কেউ প্রশ্ন কর্‌তে পারেন যে, প্রচলিত ভাষা কাকে বলে? তার উত্তরে আমি বলি, যে ভাষা আমাদের সুপরিচিত, সম্পূর্ণ আয়ত্ত, এবং যা আমরা নিত্য ব্যবহার করে' থাকি। তা খাঁটী বাঙ্গলাও নয়, খাঁটী সংস্কৃতও নয়, কিংবা উভয়ে মিলিত কোনরূপ খিচুড়িও নয়। যে সংস্কৃত-শব্দ প্রকৃত কিংবা বিকৃতরূপে বাঙ্গলা কথার সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে, সে শব্দকে আমি বাঙ্গলা বলে'ই জানি এবং মানি। কিন্তু কেবলমাত্র নূতনত্বের লোভে নতুন করে' যে সকল সংস্কৃত শব্দকে কোন লেখক জোর করে' বাঙ্গলা ভাষার ভিতর প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ খাপ্ খাওয়াতে পারেন নি, সেই সকল শব্দকে ছুঁতে আমি ভয় পাই। এবং যে সকল সংস্কৃত শব্দ স্পষ্টতঃ ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই সকল শব্দ যাতে ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে আমি লেখকদের সতর্ক হ'তে বলি। নইলে বঙ্গভাষার বনলতা যে সংস্কৃত ভাষার উদ্যানলতাকে তিরস্কৃত কর্‌বে, এমন দুরাশা আমার মনে স্থান পায় না। শব্দকল্পদ্রুম থেকে আপনা হ'তে খসে' যা আমাদের কোলে এসে পড়েছে, তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোনও আপত্তি নেই। তলার কুড়োও, কিন্তু সেই সঙ্গে গাছেরও পেড়ো না। তাতে যে পরিমাণ পরিশ্রম হবে, তার অনুরূপ ফললাভ হবে না।

মলাট-সমালোচনা

শুধু গাছ থেকে পাড়া নয়, একেবারে তার আগ্‌ডাল থেকে পাড়া গুটিকতক শব্দের পরিচয় আমি সম্প্রতি বইয়ের মলাটে পেয়েছি। এবং সে সম্বন্ধে আমার দু'একটি কথা বক্তব্য আছে। যাঁরা 'শব্দাধিক্যাৎ অর্থাধিক্যং'—মীমাংসার এই নিয়ম মানেন না, বরং তার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে 'অধিকন্তু ন দোষায়' এই উদ্ভট বচন অনুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হ'য়ে থাকেন, তাঁরাও একটু গণ্ডীর ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহসী হন না। এমন সাহিত্য-বীর বোধ হয় বাঙ্গলা দেশে খুব কম আছে, যারা বঙ্গরমণীর মাথায় 'ধম্মিল্ল' চাপিয়ে দিতে সঙ্কুচিত না হয়, যদিচ সে বেচারারা নীরবে পুরুষের সব অত্যাচারই সহ্য করে' থাকে! বঙ্কিমী যুগে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কিছু কম ছিল না। অথচ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও 'প্রাড়বিবাক্' বাক্যটি 'মলিম্লুচের' ন্যায় কটু ভাষার হিসাবে গণ্য করে', চোর এবং বিচারপতিকে একই আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। 'প্রাড়বিবাক্' বেচারা বাঙ্গালী জাতির নিকট এতই অপরিচিত ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার ঐরূপ লাঞ্ছনাতে কেউ আপত্তি করেনি। কিন্তু আজকাল ওর চাইতেও অপরিচিত শব্দও, নতুন গ্রন্থের বক্ষে কৌস্তুভ মণির মত বিরাজ কর্‌তে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি দু' একটির উল্লেখ কর্‌ব।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল জাতকবি।—তাঁর ভাল মন্দ মাঝারি সকল কবিতাতেই তাঁর কবির জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বোধহয় তাঁর রচিত এমন একটি কবিতাও নেই, যার

অন্ততঃ একটি চরণেও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন না লক্ষিত নয়। সত্যের অনুরোধে এ কথা আমি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে, তাঁর নতুন পুস্তকের নামটিতে আমার একটু খট্‌কা লেগেছিল। 'এষা' শব্দের সঙ্গে আমার ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় নি, এবং তার নামও আমি পূর্ব্বে কখন শুনিনি। কাজেই আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে, হয় ত 'আয়েষা', নয় ত 'এসিয়া', কোনরূপ ছাপার ভুলে 'এষা' রূপ ধারণ করেছে। আমার এরূপ সন্দেহ হবার কারণও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বঙ্কিম-চন্দ্র যখন 'আয়েষা'কে নিয়ে নভেল লিখেছেন, তখন তাকে নিয়ে অক্ষয়কুমার যে কবিতা রচনা কর্‌বেন, এতে আর আশ্চর্য্য হবার কারণ কি থাকৃতে পারে? 'আবার বলি ওস্‌মান! এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—এই পদটির উপর রমণীহৃদয়ের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ খাড়া করা কিছু কঠিন নয়। তারপর 'এসিয়া';—প্রাচীর এই নবজাগরণের দিনে তার প্রাচীন নিদ্রা-ভঙ্গ কর্‌বার জন্য যে কবি উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌বেন, এও ত স্বাভাবিক। যার ঘুম সহজে ভাঙ্গে না, তার ঘুম ভাঙ্গাবার দুটিমাত্র উপায় আছে,—হয় টেনে হিঁচ্‌ড়ে, নয় ডেকে। এসিয়ার ভাগ্যে টানা হেঁচ্‌ড়ানো ব্যাপারটা ত পুরো দমে চল্‌ছে, কিন্তু তাতেও যখন তার চৈতন্য হ'ল না, তখন ডাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এসিয়াকে কাব্যে দর্শনে নানারূপ ঘুমপাড়ানী মাসীপিসীর গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। এখন আবার জাগাতে হ'লে এ যুগের কবিরা

'জাগর' গান গেয়েই তাকে জাগাতে পার্‌বেন। সে গান অনেক কবি সুরে বেসুরে গাইতেও সুরু করে' দিয়েছেন। সুতরাং আমার সহজেই মনে হয়েছিল যে, অক্ষয়কুমার বড়ালও সেই কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এখন শুন্‌ছি যে, ও ছাপার ভুল নয়,—আমারই ভুল। প্রাচীন গাথার ভাষায় নাকি 'এষা'র অর্থ অন্বেষণ। একালের লেখকেরা যদি শব্দের অন্বেষণে সংস্কৃত যুগ ডিঙ্গিয়ে একেবারে প্রাচীন গাথা-যুগে গিয়ে উপস্থিত হন, তা হ'লে একেলে বঙ্গ-পাঠকদের উপর একটু অত্যাচার করা হয়; কারণ, সেই শব্দের অর্থ-অন্বেষণে পাঠক যে কোন্‌দিকে যাবে, তা স্থির কর্‌তে পারে না। আজকালকার বাঙ্গলা বুঝ্‌তে অমরের সাহায্য আবশ্যক, তারপর যদি আবার যাস্ক চর্চ্চা কর্‌তে হয়, তা হ'লে বাঙ্গলা-সাহিত্য পড়্‌বার অবসর আমরা কখন্ পাব? যাস্কের সাহায্যেও যদি তার অর্থবোধ না হয়, তা হ'লে বাঙ্গলা-সাহিত্যের চর্চ্চা যে আমরা ত্যাগ কর্‌ব, তাতে আর সন্দেহ কি? অর্থবোধ হয় না বলে' যখন আমরা আমাদের পরকালের সদ্গতির একমাত্র সহায় যে সন্ধ্যা, তারি পাঠ বন্ধ করেছি,—তখন ইহকালের ক্ষণিক সুখের লোভে যে আমরা গাথা[illegible] শব্দে রচিত বাঙ্গলা-সাহিত্য পড়্‌ব, এ আশা করা [illegible] না। তা' ছাড়া বৈদিক এবং অতি-বৈদি[illegible] আমরা বাক্যসংগ্রহ কর্‌তে আরম্ভ [illegible] যাকেই বা ছাড়্‌ব কেন? আমার [illegible] ানির নাম যদি আমি 'ফেৎকারিণী',

'ডামর' কিংবা 'উড্ডীশ' দিই, তা হ'লে কি পাঠকসম্প্রদায় খুব খুসী হবেন ?

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুস্তিকাগুলির নামকরণ বিষয়ে যে অপূর্ব্বতা দেখিয়ে থাকেন, তা আমাকে ভীত না করুক, বিস্মিত করে। আমি সাহিত্যের বাজারে মাল যাচাই কর্‌বার জন্য কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে ব্যবসা খুলে' বসিনি। সুতরাং সুধীন্দ্র বাবুর রচনার দোষগুণ দেখানো আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। একমাত্র মলাটে তাঁর লেখা যেটুকু আত্মপরিচয় দেয়, সেইটুকু আমার বিচারাধীন। 'মঞ্জুষা', 'করঙ্ক' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যে আমাদের একেবারে মুখ-দেখাদেখি নেই, এ কথা বল্‌তে পারিনে। তা হ'লেও স্বীকার কর্‌তে হবে যে, অন্ততঃ পাঠিকা-দের নিকট ও পদার্থগুলি যত সুপরিচিত, ও নামগুলি তাদৃশ [illegible]প নামের যে বিশেষ কোন সার্থকতা [illegible] মনে হয় না। আমাদের কল্পনাজাত বস্তু [illegible] সাধারণের কাছে দিইনে, বরং সত্য কথা বল্‌তে গেলে, [illegible]টরা থেকে সেগুলি বা'র করে' জনসাধা-রণের চোখের সমুখে সাজিয়ে রাখি। করঙ্কের কথা শুন্‌লেই তাম্বুলের কথা মনে হয়। পানের খিলির সঙ্গে সুধীন্দ্র বাবুর ছোট গল্পগুলির কি সাদৃশ্য আছে জানিনে। করুণরস এবং পানের রস এক জিনিস নয়। আর একটি কথা। তাম্বুলের সঙ্গে সঙ্গে চর্ব্বিতচর্ব্বণের ভাবটা মানুষের মনে সহজেই আসে। সে যাই হোক্, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার কর্‌ছি যে, সুধীন্দ্র

বাবুর আবিষ্কৃত 'বৈতানিক' শব্দ, আমি বৈতালিক শব্দের ছাপান্তর মনে করেছিলুম। হাজারে ন' শো নিরনব্বই জন বাঙ্গালী পাঠক যে ও-শব্দের অর্থ জানেন না, এ কথা বোধ হয় সুধীন্দ্র বাবু অস্বীকার করবেন না। আমার যতদূর মনে পড়ে, তাতে কেবলমাত্র ভৃগুপ্রোক্ত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে এক স্থলে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ জানা আবশ্যক মনে করিনি। এইরূপ নামে বইয়ের পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং তার পরিচয় গোপন করাই হয়। বাঙ্গলা সরস্বতীকে ছদ্মবেশ না পরালে যে তাঁকে সমাজে বা'র করা চলে না, এ কথা আমি মানিনে।

এই নামের উদাহরণ ক'টি টেনে আন্‌বার উদ্দেশ্য, আমার সেই প্রথম কথার প্রমাণ দেওয়া। সে কথা এই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের ভিতর সমালোচনার মত নামকরণেও বিজ্ঞাপনের ছাপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের আর পাঁচটা দোষের ভিতর একটা হচ্ছে তার ন্যাকামী। ন্যাকামীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া, এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে এবং ভাষায় মাধুর্য্যের ভাণ এবং ভঙ্গী। বঙ্গসাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার এত কথা বলা। আমরা এতটাই কোমলের ভক্ত হ'য়ে পড়েছি যে, শুদ্ধ স্বরকেও কোমল করতে গিয়ে বিকৃত করতে আমরা তিলমাত্র দ্বিধা করিনে। কথায় বলে, 'যত চিনি দেবে ততই মিষ্টি হবে'। কিন্তু শর্করার ভাগ অতিরিক্ত হ'লে মিষ্টান্নও যখন অখাদ্য হ'য়ে ওঠে, তখন ঐ

পদ্ধতিতে রচিত সাহিত্যও যে অরুচিকর হ'য়ে উঠ্‌বে, তাতে আর সন্দেহ কি? লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার কর্‌বার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, তাকে সুস্থ এবং সবল কর্‌বার চেষ্টা করেন, তা হ'লে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে। ভাষা যদি প্রসন্ন হয়, তা হ'লে তার কর্কশতাও সহ্য হয়। এ এতই সোজা কথা যে, এও যে আবার লোককে বোঝাতে হয়, এই মহা-আপশোষের বিষয়। যখন বঙ্গসাহিত্যে অন্ধকার আর 'বিরাজ' কর্‌বে না, তখন এ বিষয়ে আর কারও 'মনোযোগ আকর্ষণ' কর্‌বার দরকারও হবে না।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৯

সাহিত্যে চাবুক

(১)

সেদিন ষ্টার থিয়েটারে 'আনন্দ-বিদায়ের' অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল শুনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হলুম। তার প্রথম কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত লোককে দর্শকমণ্ডলী লাঞ্ছিত করেছেন; এবং তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা দেবার উদ্দেশ্যেই রঙ্গমঞ্চে আনন্দ-বিদায়ের অবতারণা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু লিখেছেন যে, তিনি সকল রকম 'মি'র বিপক্ষে। ন্যাকামি, জ্যাঠামি, ভণ্ডামি, বোকামি প্রভৃতি যে-সকল 'মি'-ভাগান্ত পদার্থের তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির যে কোন ভদ্রলোকেই পক্ষপাতী, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়; অন্ততঃ পক্ষপাতী হ'লেও, সে কথা কেউ মুখে স্বীকার কর্‌বেন না। কিন্তু সমাজে থাকতে হ'লেই পাঁচটি 'মি' নিয়েই আমাদের ঘর কর্‌তে হয়, এবং সেই কারণেই সুপরিচিত 'মি'গুলি সাহিত্যে না হোক্, জীবনে আমাদের সকলেরই অনেকটা সওয়া আছে। কিন্তু যা আছে, তার উপর যদি একটা নতুন 'মি' এসে আমাদের ঘাড়ে চাপে, তা হ'লে সেটা নিতান্ত ভয়ের বিষয় হ'য়ে ওঠে।

বীরবলের হালখাতা

আমরা এতদিন নিরীহ প্রকৃতির লোক বলে'ই পরিচিত ছিলুম। কিছুদিন থেকে ষণ্ডামি নামে একটা নতুন 'মি' আমাদের সমাজে প্রবেশ লাভ করেছে। এতদিন রাজনীতির রঙ্গভূমিতেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। সুরাট কংগ্রেসে সেই 'মি'র তাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় হয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সুরাটে যে যবনিকা-পতন হয়েছে, তা আর সহসা উঠ্‌বে না। কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, রাজনীতিতে প্রশ্রয় পেয়ে ষণ্ডামি ক্রমশঃ সমাজের অপর সকল দেশও অধিকার করে' নিয়েছে। ষণ্ডামি জিনিসটার আর যে ক্ষেত্রেই সার্থকতা থাক, সাহিত্যে নেই,—কেন না সাহিত্যে বাহুবলের কোন স্থান নেই।—ষ্টার থিয়েটারের box হ'তে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে গায়ের জোরে নামানো সহজ, কিন্তু তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে উচ্চ আসন লাভ করেছেন, বাহুবলে তাঁকে সেখান থেকে নামানো অসম্ভব। লেখকমাত্রেই নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে পরাধীন। সমালোচকদের চোখরাঙ্গানি সহ্য কর্‌তে লেখকমাত্রেরই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যজগতে ঢিলটা মার্‌লে যে, জড়জগতের পাটকেলটা আমাদের খেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ওরকম একটা নিয়ম প্রচলিত হ'লে সাহিত্যরাজ্যে আমাদের বাস করা চল্‌বে না। কারণ এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, বুদ্ধির জোর গায়ের জোরের কাছে বরাবরই হার মানে। এই কারণেই শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে-ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং লজ্জিত।

সাহিত্যে চাবুক

(২)

কিন্তু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে, এ যুগের সাহিত্যে আবার 'কবির লড়াই' ফিরে আন্‌বার প্রয়াস পেয়েছেন, তার জন্য আমি আরও বেশী দুঃখিত। ও কাজ একবার আরম্ভ কর্‌লে, শেষটা খেউড় ধর্‌তেই হবে। দ্বিজেন্দ্র বাবু বোধ হয় এ কথা অস্বীকার কর্‌বেন না যে সেটি নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।

এ পৃথিবীতে মানুষে আসলে খালি দুটি কার্য্যই কর্‌তে জানে; সে হচ্ছে হাস্‌তে এবং কাঁদ্‌তে। আমরা সকলেই নিজে হাস্‌তেও জানি, কাঁদ্‌তেও জানি; কিন্তু সকলেরই কিছু আর অপরকে হাসাবার কিংবা কাঁদাবার শক্তি নেই। অবশ্য অপরকে চপেটাঘাত করে' কাঁদানো কিংবা কাতুকুতু দিয়ে হাসানো, আমাদের সবারই আয়ত্ত,—কিন্তু সরস্বতীর বীণার সাহায্যে কেবল দুটি চারটি লোকই ঐ কার্য্য কর্‌তে পারেন। যাঁদের সে ভগবৎদত্ত ক্ষমতা আছে, তাঁদেরি আমরা কবি বলে' মেনে নিই। বাদবাকী সব বাজে লেখক। কাব্যে, আমার মতে, শুধু তিনটিমাত্র রস আছে; করুণ রস, হাস্য রস, আর হাসিকান্না-মিশ্রিত মধুর রস। যে লেখায় এর একটি না একটি রস আছে, তাই কাব্য; বাদবাকী সব নীরস লেখা,—দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি যা খুসী তা হ'তে পারে,—কিন্তু কাব্য নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে হাস্যরসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অদ্বিতীয়। তাঁর গানে হাস্যরস, ভাবে কথায় সুরে তালে লয়ে পঞ্চীকৃত হ'য়ে মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠেছে। হাসির গান তাঁর সঙ্গে জুড়ীতে

গাইতে পারে, বঙ্গসাহিত্যের আসরে এমন গুণী আর একটিও নেই। কান্নার মত হাসিরও নানাপ্রকার বিভিন্ন রূপ আছে, এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর মুখে হাসি নানা আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে কেবল আমাদের মিষ্টি হাসিই হাস্‌তে হবে, এ কথা আমি মানি নে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্র বাবু যে বলেছেন যে, কাব্যে বিদ্রূপের হাসিরও ন্যায্য স্থান আছে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিসটার প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ দিলে শুধু তার উপ টুকু থাকে, কিন্তু তার রূপটুকু থাকে না। হাস্‌তে হ'লেই আমরা অল্পবিস্তর দন্তবিকাশ কর্‌তে বাধ্য হই। কিন্তু দন্তবিকাশ কর্‌লেই যে সে ব্যাপারটা হাসি হ'য়ে ওঠে, তা নয়, —দাঁতখিঁচুনী বলে'ও পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে। সে ক্রিয়াটি যে ঠিক হাসি নয়, বরং তার উল্‌টো জীবজগতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং উপহাস জিনিসটা সাহিত্যে চল্‌লেও, কেবলমাত্র তার মুখভঙ্গীটি সাহিত্যে চলে না। কোন জিনিস দেখে যদি আমাদের হাসি পায়, তাহ'লেই আমরা অপরকে হাসাতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র যদি রাগই হয়, তাহ'লে সে মনোভাবকে হাসির ছদ্মবেশ পরিয়ে প্রকাশ কর্‌লে, দর্শকমণ্ডলীকে শুধু রাগাতেই পারি। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই কথাটি মনে রাখ্‌লে লোককে হাসাতে গিয়ে রাগাতেন না।

(৩)

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেছেন যে, নাটকাকারে parody কোন ভাষাতেই নেই। যা কোন দেশে কোন ভাষাতেই ইতিপূর্ব্বে

রচিত হয় নি, তাই সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে তিনি একটি অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বামিত্রের তপোবল আমাদের কারও নেই; সুতরাং বিশ্বামিত্রও যখন নূতন সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন, তখন আমরা যে হব, এ ত নিশ্চিত।

মানুষে মুখ ভেংচালে দর্শকমাত্রই হেসে থাকে। কেন যে সে কাজ করে, তার বিচার অনাবশ্যক; কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, ওরূপ মুখভঙ্গী দেখ্‌লে মানুষের হাসি পায়। Parody হচ্ছে সাহিত্যে মুখ ভেংচানো। Parody নিয়ে যে নাটক হয় না, তার কারণ দু ঘণ্টা ধরে' লোকে একটানা মুখ ভেংচে যেতে পারে না: আর যদিও কেউ পারে ত, দর্শকের পক্ষে তা অসহ্য হ'য়ে ওঠে। হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দেয় বলে'ই, এবং তার কোন মানেমোদ্দা নেই বলে'ই, মানুষের মুখ-ভেংচানি দেখে হাসি পায়। সুতরাং ভেংচানির মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, সুনীতি, সুরুচি প্রভৃতি ভীষণ জিনিস সব পুরে' দিতে গেলে, ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে রুচিকর হয় না। ঐরূপ করাতে ভেংচানির শুধু ধর্ম্মনষ্টই হয়। শিক্ষাপ্রদ ভেংচানির সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে দ্বিজেন্দ্র বাবু রসজ্ঞানের পরিচয় দেন নি।—যদি parodyর মধ্যে কোনরূপ দর্শন থাকে ত সে দন্তের দর্শন।

(৪)

দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁর 'আনন্দ-বিদায়ে'র ভূমিকায় প্রকারান্তরে স্বীকারই করেছেন যে, লোক হাসানো নয়, লোকশিক্ষা দেওয়াই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। প্রহসন শুধু অছিলা মাত্র। বেত

হাতে গুরুমশাইগিরি করা, এ যুগের সাহিত্যে কোন লোকের পক্ষেই শোভা পায় না। 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—এ কথা শুধু অবতীর্ণ ভগবানের?মুখেই সাজে, সামান্য মানবের মুখে সাজে না। লেখকেরা যদি নিজেদের এক একটি ক্ষুদ্র অবতারস্বরূপ মনে করেন, কিংবা যদি তাঁরা সকলে কেষ্ট বিষ্টু হ'য়ে ওঠেন, তাহ'লে পৃথিবীর সাধুদেরও পরিত্রাণ হবে না, এবং দুষ্টদেরও শাসন হবে না; লাভের মধ্যে লেখকেরা পরস্পর শুধু কলমের খোঁচা-খুঁচি কর্‌বেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ইচ্ছাও যে তাই হয়। এবং তিনি ঐরূপ খোঁচা-খুঁচি হওয়াটা যে উচিত, তাই প্রমাণ কর্‌বার জন্য বিলেতী নজির দেখিয়েছেন। তিনি বলেন যে, Wordsworthকে Browning চাব্‌কেছিলেন, এবং Wordsworth, Byron এবং Shelleyকে চাব্‌কেছিলেন। বিলেতের কবিরা যে অহরহ পরস্পরকে চাব্‌কা-চাব্‌কি করে' থাকেন, এ জ্ঞান আমার ছিল না।

Browning, Wordsworth সম্বন্ধে Lost Leader নামে যে একটি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন, সেটিকে কোন হিসাবেই চাবুক বলা যায় না। কবিসমাজের সর্ব্বমান্য এবং পূজ্য দলপতি, দলত্যাগ করে' অপর-দলভুক্ত হওয়াতে কবিসমাজ যে গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, ঐ কবিতাতে Browning সেই দুঃখই প্রকাশ করেছেন। Wordsworth যে Byron এবং Shelleyকে চাব্‌কেছিলেন, এ কথা আমি জানতুম না।

Byron অবশ্য তাঁর সমসাময়িক কবি এবং সমালোচকদের প্রতি দু'হাতে ঘুঁষো চালিয়েছিলেন, কিন্তু সে আত্মরক্ষার্থ। অহিংসা পরমধর্ম্ম হ'লেও, আততায়ীবধে পাপ নেই। দ্বিজেন্দ্র বাবু যে নজির দেখিয়েছেন, সেই নজিরের বলেই প্রমাণ করা যায় যে, চাবুক পদার্থ টার বিলেতী কবিসমাজে চলন থাক্‌লেও, তার ব্যবহারে যে সাহিত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে, তা নয়। Wordsworth, Shelley, Byron প্রভৃতি কোন কবিই কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর তাড়নার ভয়ে নিজের পথ ছাড়েননি, কিংবা সাহিত্য-রাজ্যে পাশ কাটিয়ে যাবারও চেষ্টা করেন নি। কবিমাত্রেরই মত যে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরঃধর্ম্মো ভয়াবহ।' চাবুকের ভয় কেবলমাত্র তারাই করে, যাদের 'স্বধর্ম্ম' বলে' জিনিসটা আদপেই নেই, এবং সাহিত্যে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া যাদের গত্যন্তর নেই। এ শ্রেণীর লেখকেরা কি লেখেন, আর না লেখেন, তাতে সমাজের কিংবা সাহিত্যের বড় কিছু আসে যায় না।

এ কথা আমি অস্বীকার করিনে যে, সাহিত্যে চাবুকের সার্থকতা আছে। হাসিতে রস এবং কষ দুই-ই আছে। এবং ঠিক মাত্রা অনুসারে কষের খাদ দিতে পার্‌লে হাস্যরসে জমাট বাঁধে। কিন্তু তাই বলে' 'কষে'র মাত্রা এত অধিক বাড়ানো উচিত নয় যে, তাতে হাসি জিনিসটা ক্রমে অন্তর্হিত হ'য়ে, যা খাঁটী মাল বাকী থাকে, তাতে শুধু 'কশাঘাত' করা চলে। সাহিত্যেও অপরের গায়ে nitric acid ঢেলে দেওয়াটা বীরত্বের পরিচয় নয়। দ্বিজেন্দ্র বাবু 'কষাঘাত'কে 'কশাঘাত' বলে' ভুল

করে', ষত্ব-ণত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেন নি। সাহিত্যে কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর চাবুক প্রয়োগ করাটা অনাচার। সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠেই ওর প্রয়োগটা সনাতন প্রথা। মিথ্যা যখন সমাজে আস্কারা পেয়ে সত্যের সিংহাসন অধিকার করে' বসে, এবং রীতি যখন নীতি বলে' সম্মান লাভ করে ও সমগ্র সমাজের উপর নিজের শাসন বিস্তার করে, তখনই বিদ্রূপের দিন আসে। পৃথিবীতে সব চাপা যায়, কিন্তু হাসি চাপা যায় না। ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি চাবুকের প্রয়োগ চলে না। কোন লেখক যদি নিতান্ত অপদার্থ হয়, তাহ'লে তার উপর কশাঘাত করাটা কেবল নিষ্ঠুরতা; কেন না, গাধা পিটে ঘোড়া হয় না। অপর পক্ষে যদি কোন লেখক সত্য সত্যই সরস্বতীর বরপুত্র হন, তা হ'লে তাঁর লেখার কোন বিশেষ অংশ কিংবা ধরণ মনোমত না হ'লেও, সেই বিশেষ ধরণের প্রতি যেরূপ বিদ্রূপ সঙ্গত, সেরূপ বিদ্রূপকে আর যে নামেই অভিহিত কর, 'চাবুক' বলা চলে না। কারণ, ওরূপ ক্ষেত্রে কবির মর্য্যাদা' রক্ষা না করে' বিদ্রূপ কর্‌লে সমালোচকেরও আত্মমর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। কোন ফাঁক পেলেই, কলি যে ভাবে নলের দেহে প্রবেশ করেছিলেন, সমালোচকের পক্ষে সেই ভাবে কবির দেহে প্রবেশ করা শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়।

(৫)

চাবুক ব্যবহার কর্‌বার আর একটি বিশেষ দোষ আছে। ও কাজ কর্‌তে কর্‌তে মানুষের খুন চড়ে' যায়। দ্বিজেন্দ্র বাবুরও

তাই হয়েছে। তিনি একমাত্র 'চাবুকে' সন্তুষ্ট না থেকে, ক্রমে 'ঝাঁটিকা', 'চাঁটিকা' প্রভৃতি পদার্থেরও প্রয়োগ কর্‌বার চেষ্টা করেছেন। আমি বাঙ্গলায় অনাবশ্যকে 'ইকা' প্রত্যয়ের বিরোধী। সুতরাং আমি নির্ভয়ে দ্বিজেন্দ্র বাবুকে এই প্রশ্ন কর্‌তে পারি যে, 'চাঁটিকা'র 'ইকা' বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, সে জিনিসটা মারাতে কি কোন লেখকের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়? 'ঝাঁটা' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সম্মার্জ্জনীর উদ্দেশ্য ধুলো ঝাড়া, গায়ের ঝালঝাড়া নয়। বিলেতী সরস্বতী মাঝে মাঝে রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লেও, বঙ্গসরস্বতীর পক্ষে ঝাঁটা উঁচিয়ে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওয়াটা যে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।

(৬)

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিজে মার-মূর্ত্তি ধারণ কর্‌বার যে কারণ দেখিয়েছেন, আমার কাছে সেটি সব চেয়ে অদ্ভুত লাগ্‌ল। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে, 'যদি কোন কবি কোন কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য।'

এক কথায়, সাহিত্যের মঙ্গলের জন্য নৈতিক চাবুক মারাই দ্বিজেন্দ্র বাবুর অভিপ্রায়। পৃথিবীতে অনেক লোকের ধারণা যে, কাউকে ধর্ম্মাচরণ শেখাতে হ'লে মৃত্যুর মত তার চুল চেপে ধরাটাই তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, এবং সেই জন্য কর্ত্তব্য। স্কুলে, জেলখানায়, ঐ সমাজের মঙ্গলের জন্যই বেত মারবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজকাল অনেকেরই এ জ্ঞান জন্মেছে

যে, ও পদ্ধতিতে সমাজের কোন মঙ্গলই সাধিত হয় না, লাভের মধ্যে শুধু, যে বেত মারে এবং যাকে মারা হয়, উভয়েই তার ফলে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্ব লাভ করে। অপরের উপর অত্যাচার কর্‌বার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োগটা যে বর্ব্বরতা, এ কথা সকলেই মানেন,—কিন্তু একই উদ্দেশ্যে নৈতিক বলের প্রয়োগটাও যে বর্ব্বরতামাত্র, এ সত্য আজও সকলের মনে বসে' যায় নি। কঠিন শাস্তি দেবার প্রবৃত্তিটি আসলে রূপান্তরে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি। ও জিনিসটিকে সমাজের মঙ্গলজনক মনে করা শুধু নিজের মনভোলানো মাত্র। নীতিরও একটা বোকামি, গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামি আছে। নিত্যই দেখতে পাওয়া যায়, একরকম প্রকৃতির লোকের হাতে নীতি পদার্থটা পরের উপরে অত্যাচার কর্‌বার একটা অস্ত্রমাত্র। ধর্ম্ম এবং নীতির নামে মানুষকে মানুষ যত কষ্ট দিয়েছে, যত গর্হিত কার্য্য করেছে, এমন বোধ হয় আর কিছুরই সাহায্যে করেনি।—আশা করি, দ্বিজেন্দ্রবাবু সে শ্রেণীর লোক নন, যাঁদের মতে, সুনীতির নামে সাত খুন মাপ হয়।—ইতিহাসে এর ধারাবাহিক প্রমাণ আছে যে, নীতির বোকামি, গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামির অত্যাচার সাহিত্যকে পূরোমাত্রায় সহ্য কর্‌তে হয়েছে। কারণ, সাহিত্য সকল দেশে সকল যুগেই বোকামি, গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামির বিপক্ষ, এবং প্রবল শত্রু।

নীতি অর্থাৎ যুগবিশেষে প্রচলিত রীতির ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষকে বাঁধা; কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষকে মুক্তি

দেওয়া। কাজেই পরস্পরের সঙ্গে দা-কুম্ড়োর সম্পর্ক। ধর্ম্ম এবং নীতির দোহাই দিয়েই মুসলমানেরা আলেকৃজণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরী ভস্মসাৎ করেছিল।

এ যুগে অবশ্য নীতি-বীরদের বাহুবলের এক্তিয়ার হ'তে আমরা বেরিয়ে গেছি, কিন্তু সুনীতির গোয়েন্দা আজও সাহিত্যকে চোখে চোখে রাখেন, এবং কারও লেখায় কোন ছিদ্র পেলেই সমাজের কাছে লেখককে ধরিয়ে দিতে উৎসুক হন। কাব্যামৃতরসাস্বাদ করা এক, কাব্যের ছিদ্রান্বেষণ করা আর। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কবিতার রূপকমাত্র। কারণ, সে বাঁশীর ধর্ম্মই এই যে, তা 'মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।' ছিদ্রান্বেষী নীতিধর্ম্মীদের হাত পড়্লে সে বাঁশীর ফুটোগুলো যে তাঁরা বুজিয়ে দিতে চেষ্টা কর্বেন, তাতে আর সন্দেহ কি? এক শ্রেণীর লোক চিরকালই এই চেষ্টা করে' অকৃতকার্য্য হয়েছেন; কারণ, সে ছিদ্র স্বয়ং ভগবানের হাতে- ? করা বিঁধ্, তাকে নিরেট করে' দেবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। 'মি' জিনিসটিই খারাপ, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষের পক্ষে সব চাইতে সর্ব্বনেশে 'মি' হচ্ছে 'আমি'। কারণ, ও পদার্থটির আধিক্য থাক্‌লে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সবই লুপ্ত হ'য়ে আসে। অন্যান্য সকল 'মি' ঐ 'আমি'কে আশ্রয় করে'ই থাকে। কিন্তু 'আমি' এত অব্যক্তভাবে আমাদের সমস্ত মনটায় ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে যে, আমরা নিজেও বুঝ্‌তে পারিনে যে, তারই তাড়নায় আমরা পরের উপর কুব্যবহার কর্‌তে উদ্যত

হই,—সমাজ কিংবা সাহিত্য কারও মঙ্গলের জন্য নয়। এই কথাটা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লে আমরা পরের উপর নৈতিক চাবুক প্রয়োগ কর্‌তে কুণ্ঠিত হই। এই কারণেই, যদি একজন কবি অপর একজন সমসাময়িক কবির সমালোচক হ'য়ে দাঁড়ান, তাহ'লে তাঁর নিকট কবি এবং কাব্যের ভেদবুদ্ধিটি নষ্ট হওয়া অতি সহজ।

(৭)

দ্বিজেন্দ্র বাবু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হ'তে দুর্নীতির যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা হাস্যরসাত্মক না হোক্, হাস্যকর বটে। 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না'—এ কথাটা ভারতবাসীর পক্ষে যে অপ্রীতিকর, তা আমি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য—কেন না, যামিনী গেলেও আমরা জাগ্‌বার বিপক্ষে।—আমরা শুধু রাতে নয়, অষ্টপ্রহর ঘুমতে চাই। সুতরাং যদি কেউ অন্ধকারের মধ্যেই চোখ্ খোল্‌বার পক্ষপাতী হন, তাহ'লে তাঁর উপর বিরক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক!—সে যাই হোক্, ও গানটিতে বঙ্গসাহিত্যের যে কি অমঙ্গল ঘটেছে, তা আমি বুঝ্‌তে পারলুম না। এ দেশের কাব্যরাজ্যে অভিসার বহুকাল হ'তে প্রচলিত আছে। রাধিকার নামে বেনামী কর্‌লে, ও কবিতাটি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্র বাবুর বোধ হয় আর কোনও আপত্তি থাক্‌ত না। আমরা যে নাম জিনিসটির এতটা অধীন হ'য়ে পড়েছি, সেটা আমাদের পক্ষে মোটেই শ্লাঘার বিষয় নয়। আর যদি দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে ও গানটি ভদ্রসমাজে অশ্রাব্য হয়, তাহ'লে সেটির parody করে' তিনি কি তাকে এতই সুশ্রাব্য

করে' তুলেছেন যে, সেটি রঙ্গালয়ে চীৎকার করে' না গাইলে আর সমাজ উদ্ধার হয় না? দ্বিজেন্দ্র বাবু যেমন বিলেতী নজিরের বলে', চাব্‌কা-চাব্‌কি বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত কর্‌তে চেয়েছেন, তেমনি তিনি আমাদের সাহিত্যে বিলেতী puritanismএর ভূত নামাতে চান। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের অনেক ত্রুটী আছে—কিন্তু puritanism নামক ন্যাকামি এবং গোঁড়ামি হ'তে এ দেশীয় সাহিত্য চিরকালই মুক্ত ছিল। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মত যদি আমাদের গ্রাহ্য কর্‌তে হয়, তাহ'লে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' থেকে সুরু করে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পর্য্যন্ত, অন্ততঃ হাজার বৎসরের সংস্কৃত কাব্য সকল আমাদের অগ্রাহ্য কর্‌তে হবে।—একখানিও টিঁক্‌বে না। তারপর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে' ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত, সকল কবির সকল গ্রন্থই আমাদের অস্পৃশ্য হ'য়ে উঠ্‌বে। একখানিও বাদ যাবে না। যাঁরা রবীন্দ্র বাবুর সরস্বতীর গাত্রে কোথায় কি তিল আছে, তাই খুঁজে' বেড়ান,—তাঁরা যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-কবিদের সরস্বতীকে কি করে' তুষারগৌরী-রূপে দেখেন, তা আমার পক্ষে একেবারেই দুর্ব্বোধ্য।—শেষ কথা, puritanism-এর হিসেব থেকে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্র বাবুও কিছু কম অপরাধী নন। তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই রয়েছে।—'আনন্দ-বিদায়' moral text-book বলে' গ্রাহ্য হবে, এ আশা যদি তিনি করে' থাকেন, তাহ'লে সে আশা সফল হবে না।

মাঘ, ১৩১৯

তর্জ্জমা

আমরা ইংরাজ জাতিকে কতকটা জানি, এবং আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন হিন্দু জাতিকে তার চাইতেও বেশী জানি; আমরা চিনিনে শুধু নিজেদের।

আমরা নিজেদের চেন্‌বার কোন চেষ্টাও করিনে, কারণ আমাদের বিশ্বাস যে, সে জানার কোন ফল নেই; তা ছাড়া নিজেদের ভিতর জান্‌বার মত কোন পদার্থ আছে কিনা, সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে।

বাঙ্গালীর নিজস্ব বলে' মনে কিম্বা চরিত্রে যদি কোন পদার্থ থাকে, তাকে আমরা ডরাই,—তাই চোখের আড়াল করে' রাখ্‌তে চাই। আমাদের ধারণা যে বাঙ্গালী তার বাঙ্গালীত্ব না হারালে আর মানুষ হয় না। অবশ্য অপরের কাছে তিরস্কৃত হ'লে আমরা রাগ করে' ঘরের ভাত, (যদি থাকে ত) বেশী করে' খাই; কিন্তু উপেক্ষিত হ'লেই আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই। মান এবং অভিমান এক জিনিস নয়। প্রথমটির অভাব হ'তেই দ্বিতীয়টি জন্মলাভ করে।

আমরা যে নিজেদের মান্য করিনে, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি,—হয় বর্ত্তমান ইউরোপের দিকে এগোনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছোনো। আমরা নিজের পথ জানিনে বলে', আজও মনঃস্থির করে' উঠ্‌তে পারিনি

যে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম এই দুইটির মধ্যে কোন্ দিক অবলম্বন কর্‌লে আমরা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌছব। কাজেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন পা এগিয়ে, আবার ভারতবর্ষের দিকে দু'পা পিছিয়ে আসি—আবার অগ্রসর হই, আবার পিছু হটি। এই কুর্ণিস করাটাই আমাদের নব-সভ্যতার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

উক্ত ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরব-সূচক না হ'লেও, মেনে নিতে হবে। যা মনে সত্য বলে' জানি, সে সম্বন্ধে মনকে চোখ ঠেরে কোন লাভ নেই! আমরা দোটানার ভিতর পড়েছি—এই সত্যটি সহজে স্বীকার করে' নিলে, আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌বে। যা আজ উভয়-সঙ্কট বলে' মনে হচ্ছে, তাই আমাদের উন্নতির স্রোতকে একটি নির্দ্দিষ্ট পথে বদ্ধ রাখ্‌বার উভয় কূল বলে' বুঝ্‌তে পার্‌ব। আমরা যদি চল্‌তে চাই ত, আমাদের একূল ওকূল দুকূল রক্ষা করে'ই চলতে হবে।

আমরা স্পষ্ট জানি আর না জানি, আমরা এই উভয় কূল অবলম্বন করে' চল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সেই যুগধর্ম্ম অনুসারে চল্‌তে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। আমাদের এ যুগ সত্যযুগও নয়, কলিযুগও নয়,—শুধু তর্জ্জমার যুগ। আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও, একেলে বিদেশী এবং সেকেলে স্বদেশী সভ্যতার অনুবাদ করে'ই দিন কাটাই। আমাদের মুখের

প্রতিবাদও ঐ একই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সংস্কৃতের অনুবাদ করে' নূতনের প্রতিবাদ করি, এবং ইংরেজীর অনুবাদ করে' পুরাতনের প্রতিবাদ করি। আসলে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য,—সকল ক্ষেত্রেই তর্জ্জমা করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান যুগটি তর্জ্জমার যুগ বলে' গ্রাহ্য করে' নিয়ে, ঐ অনুবাদ কার্য্যটি ষোলআনা ভালরকম করার উপর আমাদের পুরুষার্থ এবং কৃতিত্ব নির্ভর করছে।

পরের জিনিসকে আপনার করে' নেবার নামই তর্জ্জমা। সুতরাং ও কার্য্য করাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই, এবং নিজেদের দৈন্যের পরিচয় দেওয়া হয় মনে করে'ও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেননা নিজের ঐশ্বর্য্য না থাকলে লোকে যেমন দান করতে পারে না, তেমনি, নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে লোকে গ্রহণও করতে পারে না। স্মৃতির মতে, দাতা এবং গ্রহীতার পরস্পর যোগ না হ'লে দানক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মৃত ব্যক্তি দাতাও হ'তে পারে না, গ্রহীতাও হ'তে পারে না; কারণ দান এবং গ্রহণ উভয়ই জীবনের ধর্ম্ম। বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিকট কোটি কোটি মানব ধর্ম্মের জন্য ঋণী। কিন্তু তাঁদের দত্ত অমূল্য রত্ন তাঁদের হাত থেকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁদের সমকালবর্ত্তী জনকতক মহাপুরুষেই ছিল। এবং শিষ্য-পরম্পরায় তাঁদের মত আজ লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের সামগ্রী

হ'য়ে উঠেছে। পৃথিবীতে গুরু হওয়া বেশী শক্ত, কিম্বা শিষ্য হওয়া বেশী শক্ত, বলা কঠিন। যাঁদের বেদান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে, পুরাকালে গুরুরা কাউকে ব্রহ্মবিদ্যা দান কর্‌বার পূর্ব্বে, শিষ্যের সে বিদ্যা গ্রহণ কর্‌বার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা কর্‌তেন। উপনিষদকে গুহ্যশাস্ত্র করে' রাখ্‌বার উদ্দেশ্যই এই যে, যাদের শিষ্য হবার সামর্থ্য নেই, এমন লোকেরা ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিষ্ঠে ফলাতে না পারে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, শক্তিমান গুরু হবার একমাত্র উপায়—পূর্ব্বে ভক্তিমান শিষ্য হওয়া। বর্ত্তমান যুগে আমরা ভক্তি পদার্থটি ভুলে' গেছি, আমাদের মনে আছে শুধু অভক্তি ও অতিভক্তি। এ দু'য়ের একটিও সাধুতার লক্ষণ নয়, তাই ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপর কাউকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।

আমরা কথায় বলি, জ্ঞানলাভ করি; কিন্তু আসলে জ্ঞান উত্তরাধিকারীসত্বে কিম্বা প্রসাদস্বরূপে লাভ কর্‌বার পদার্থ নয়। আমরা সজ্ঞানে জন্মলাভ করিনে, কেবল জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌বার ক্ষমতামাত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হই। জানা ব্যাপারটি মানসিক চেষ্টার অধীন, জ্ঞান একটি মানসিক ক্রিয়া মাত্র, এবং সে ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ বিকাশ। মন পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ শ্লেট নয়, যার উপর বাহ্যজগৎরূপ পেন্‌সিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায়; অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটও নয়, যা কোনরূপ অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যজগতের ছায়া

ধরে' রাখে। যে প্রক্রিয়ার বলে আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিজের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে নিজের অন্তর্ভূত করে' নিতে পারি,—তারি নাম জ্ঞান। আমরা মনে মনে যা তর্জ্জমা করে' নিতে পারি, তাই আমরা যথার্থ জানি ; যা পারিনে, তার শুধু নামমাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ঐ তর্জ্জমা করার শক্তির উপরই মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। সুতরাং একাগ্রভাবে তর্জ্জমা কার্য্যে ব্রতী হওয়াতে আমাদের পুরুষকার বৃদ্ধি পাবে বই ক্ষীণ হবে না।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আমরা সকলে মিলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, হয় ইউরোপীয় নয় আর্য্য-সভ্যতার তর্জ্জমা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু ফলে আমরা তর্জ্জমা না করে' শুধু নকলই কর্‌ছি। নকল করার মধ্যে কোনরূপ গৌরব বা মনুষ্যত্ব নেই। মানসিক শক্তির অভাববশতঃই মানুষে যখন কোনও জিনিস রূপান্তরিত করে' নিজের জীবনের উপযোগী করে' নিতে পারে না, অথচ লোভবশতঃ লাভ কর্‌তে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না, তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চ্চার অভাববশতঃ দিন দিন সে শক্তি হ্রাস হ'তে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমরা নিজেদের চারিপাশে জড় করে'ও সেটিকে অন্তরঙ্গ কর্‌তে পারিনি, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা মাঝে মাঝে সেটিকে ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্য ছট্‌ফট্‌ করি। মানুষে যা আত্মসাৎ কর্‌তে

পারে না তাই ভস্মসাৎ করতে চায়। আমরা মুখে যাই বলিনে কেন, কাজে, পূর্ব্ব সভ্যতা নয়, পশ্চিম সভ্যতারই নকল করি; তার কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের চোখের সুমুখে সশরীরে বর্ত্তমান, অপর পক্ষে আর্য্য-সভ্যতার প্রেতাত্মামাত্র অবশিষ্ট। প্রেতাত্মাকে আয়ত্ত করতে হ'লে বহু সাধনার আবশ্যক। তা ছাড়া প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, দেহমুক্ত আত্মার সম্পর্কে আসতে হ'লে অপর একটি দেহতে তাকে আশ্রয় দেওয়া চাই; একটি প্রাণীর মধ্যস্থতা ব্যতীত প্রেতাত্মা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আমাদের সমাজের প্রাচীন দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রাণ নাই। শব প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হ'লে মানুষ হয় না, বেতাল হয়। বেতাল-সিদ্ধ হবার দুরাশা খুব কম লোকেই রাখে, কাজেই শুধু মন নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ রয়েছে, সাধারণতঃ লোকে তারই অনুকরণ করে। অনুকরণ ত্যাগ করে' যদি আমরা এই নব-সভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তা হ'লেই সে সভ্যতা নিজস্ব হ'য়ে উঠবে, এবং ঐ ক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব, এবং বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়ে তুলব।

তর্জ্জমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে', এখন কি উপায়ে আমরা সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হব, সে সম্বন্ধে আমার দু'চারটি কথা বলবার আছে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ।

এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসেবে সত্য, এবং আধ্যাত্মিক হিসেবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বলে সংসার-যাত্রার উপযোগী সকল কার্য্য কর্‌তে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম্ম, যার ফল একে নয়, দশে লাভ করে, তা' কর্‌বার জন্য মনোবল আবশ্যক। সমাজে, সাহিত্যে যা কিছু মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন পদার্থটি বিদ্যমান। যা মনে ধরা পড়ে তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেই কথা অবশেষে কার্য্যরূপে পরিণত হয়; কথার সূক্ষ্মশরীর কার্য্যরূপ স্থূলদেহ ধারণ করে। আগে দেহটি গড়ে' নিয়ে, পরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌বার চেষ্টাটি একেবারেই বৃথা। কিন্তু আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে' শুধু তার দেহটি আয়ত্ত কর্‌বার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ, নিজের রূপ নিজেই গড়ে' নেয়। নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলেই বীজ ক্রমে বৃক্ষরূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারি, তাহ'লেই আমাদের সমাজ নব কলেবর ধারণ কর্‌বে। এই নব-সভ্যতাকে মনে সম্পূর্ণরূপ পরিপাক কর্‌তে পার্‌লেই আমাদের কান্তি পুষ্ট হবে। কিন্তু যতদিন সে সভ্যতা আমাদের মুখস্থ থাক্‌বে কিন্তু উদরস্থ হবে না, ততদিন তার কোন অংশই আমরা জীর্ণ কর্‌তে পার্‌ব না। আমরা যে ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তর্জ্জমা কর্‌তে পারিনি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ

মনোভাবসকল শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় করে' রয়েছে, সমগ্রজাতির মনে স্থান পায়নি। আমরা ইংরেজীভাব ভাষায় তর্জ্জমা কর্‌তে পারিনে বলে'ই আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না,—বোঝে শুধু ইংরেজী-শিক্ষিত লোকে। এ দেশের জনসাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মত কিছু নেই—আমাদের নিজস্ব বলে' কোন পদার্থ নেই—আমরা পরের সোনা কানে দিয়ে অহঙ্কারে মাটিতে পা দিইনে। অপরপক্ষে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দেবার মত ধন ছিল, তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজ সমগ্র জাতি ধনী হ'য়ে আছে। ঋষিবাক্যসকল লোকমুখে এমনি সুন্দর ভাবে তর্জ্জমা হ'য়ে গেছে যে, তা আর তর্জ্জমা বলে' কেউ বুঝ্‌তে পারেন না। এদেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে' বোঝাতে হয় না, অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়! আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে' অপর দেহ গ্রহণ কর্‌লে পূর্ব্বদেহের স্মৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহত্যাগ করে' অপর একটি ভাষার দেহ অবলম্বন করে, তা হ'লেই সেটি যথার্থ অনূদিত হয়।

উপযুক্ত তর্জ্জমার গুণেই বৈদান্তিক মনোভাবসকল হিন্দু-সন্তানমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে। এদেশে এমন লোক বোধ হয় নেই, যার মনটিকে নিংড়ে নিলে অন্ততঃ এক

ফোঁটাও গৈরিক রঙ না পাওয়া যায়। আর্য্য-সভ্যতার প্রেতাত্মা উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ তার আত্মাটি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সুষুপ্ত অবস্থায় রয়েছে—যদি আবশ্যক হয় ত সেটিকে সহজেই জাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক কথাটি বল্‌তে পার্‌লে অপরের মনের দ্বার, আরব্য-উপন্যাসের দস্যুদের ধনভাণ্ডারের দ্বারের মত, আপনি খুলে' যায়। আমরা ইংরেজী-শিক্ষিত লোকেরা জনসাধারণের মনের দ্বার খোল্‌বার সঙ্কেত জানিনে, কারণ আমরা তা জান্‌বার চেষ্টাও করিনে। যে সকল কথা আমাদের মুখের উপর আল্‌গা হয়ে রয়েছে, কিন্তু মনে প্রবেশ করেনি, সেগুলি আমাদের মুখ থেকে খসে' পড়্‌লেই যে অপরের অন্তরে প্রবেশ লাভ কর্‌বে—এ আশা বৃথা।

আমরা যে আমাদের শিক্ষালব্ধ ভাবগুলি তর্জ্জমা কর্‌তে অকৃতকার্য্য হয়েছি, তার প্রমাণ ত সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দু'বেলাই পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত, সংস্কৃত 'ছায়ার' সাহায্য ব্যতীত বুঝ্‌তে পারা যায় না, তেমনি আমাদের নব-সাহিত্যের কৃত্রিম প্রাকৃত, ইংরেজী ছায়ার সাহায্য ব্যতীত বোঝা যায় না। সমাজে না হোক্, সাহিত্যে 'চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।' কিন্তু আমাদের নব-সাহিত্যের বস্তু যে চোরাই মাল, তা ইংরেজী-সাহিত্যের পাঠক-মাত্রেরই কাছে ধরা পড়ে। আমরা ইংরেজী-সাহিত্যের সোনা রূপো যা চুরি করি, তা গলিয়ে নিতেও শিখিনি। এইত গেল সাহিত্যের কথা। রাজনীতি বিষয়ে আমাদের সকল ব্যাপার

যে আগাগোড়াই নকল, এ বিষয়ে বোধ হয় আর দু'মত নেই, সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম এবং দর্শন এই দু'টি জিনিস আমাদের একচেটে, এবং অন্য কোন বিষয়ে না হোক্, এই দুই বিষয়ে আমাদের সহজ কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীদের এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, তার প্রমাণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে মনুর ধর্ম্ম religion হ'য়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভুল তর্জ্জমার বলে ব্যবহার-শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রের ভেদজ্ঞান আমাদের লুপ্ত হয়েছে। ধর্ম্মের অর্থ ধরে' রাখা, এবং মোক্ষের অর্থ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এ দুয়ের কাজ যে এক নয়, তা শুধু ইংরেজী-নবিস আর্য্য-সন্তানরাই বুঝ্‌তে পারেন না।

গীতা আমাদের হাতে পড়্‌বামাত্র তার হরিভক্তি উড়ে' যায়। সেই কারণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'গীতায় ঈশ্বরবাদের' প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নব্য পণ্ডিতসমাজে শুধু বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর গীতার 'কর্ম্ম' ইংরাজী work রূপ ধারণ করে' আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে; অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্ম কাণ্ডহীন হয়েই আমাদের কাছে উচ্চ বলে গণ্য হয়েছে। এই ভুল তর্জ্জমার প্রসাদেই, যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য পরের হিত এবং নিজের আত্মার উন্নতি সাধন—পরলোকের অভ্যুদয়ও নয়—সেই কর্ম্ম আজকাল ইহলোকের অভ্যুদয়ের জন্য ধর্ম্ম বলে' গ্রাহ্য

হয়েছে। যে কাজ মানুষে পেটের দায়ে নিত্য করে' থাকে, তা করা কর্ত্তব্য এইটুকু শেখাবার জন্য, ভগবানের যে ভোগায়তন দেহ ধারণ করে' পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'বার আবশ্যকতা ছিল না,—এ সোজা কথাটাও আমরা বুঝতে পারিনে। ফলে আমাদের কৃত গীতার অনুবাদ বক্তৃতাতেই চলে, জীবনে কোন কাজে লাগে না।

একদিকে আমরা এ দেশের প্রাচীন মতগুলিকে যেমন ইংরেজী পোষাক পরিয়ে তার চেহারা বিল্‌কুল্ বদ্‌লে দিই, তেমনি অপর দিকে, ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানকেও আমরা সংস্কৃত ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়ে লোকসমাজে বার করি।

নিত্যই দেখ্‌তে পাই যে, খাঁটি জর্ম্মান মাল স্বদেশী বলে' পাঁচজনে সাহিত্যের বাজারে কাটাতে চেষ্টা কর্‌ছে। হেগেলের দর্শন শঙ্করের নামে বেনামি করে' অনেকে কতক পরিমাণে অজ্ঞ লোকদের কাছে চালিয়েও দিয়েছেন। আমাদের মুক্তির জন্য হেগেলেরও আবশ্যক আছে, শঙ্করেরও আবশ্যক আছে; কিন্তু তাই বলে' হেগেলের মস্তক মুণ্ডন করে' তাঁকে আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কন্থা পরিয়ে শঙ্কর বলে' সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করে' দেওয়াতে কোন লাভ নেই। হেগেলকে ফকির না করে' যদি শঙ্করকে গৃহস্থ কর্‌তে পারি, তা'তে আমাদের উপকার বেশী।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ ভুল তর্জ্জমা অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে! উদাহরণ স্বরূপ Evolutionএর কথাটা ধরা যাক্। ইভলিউসনের

দোহাই না দিয়ে আমরা আজকাল কথাই কইতে পারিনে। আমরা উন্নতিশীল হই, আর স্থিতিশীলই হই, আমাদের সকল প্রকার শীলই ঐ ইভলিউসন আশ্রয় করে' রয়েছে। সুতরাং ইভলিউসনের যদি আমরা ভুল অর্থ বুঝি তা হ'লে, আমাদের সকল কার্য্যই যে আরম্ভে পর্য্যবসিত হবে সে ত ধরা কথা। বাঙ্গলায় আমরা ইভলিউসন 'ক্রম-বিকাশবাদ,' 'ক্রমোন্নতিবাদ' ইত্যাদি শব্দে তর্জ্জমা করে' থাকি। ঐরূপ তর্জ্জমার ফলে, আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে যে, মাসিক পত্রের গল্পের মত, জগৎ পদার্থটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সৃষ্টির বইখানি আদ্যোপান্ত লেখা হ'য়ে গেছে, শুধু প্রকৃতির ছাপাখানা থেকে অল্প অল্প করে' বেরচ্চে, এবং যে অংশটুকু বেরিয়েছে তার থেকেই তার রচনা-প্রণালীর ধরণ আমরা জান্‌তে পেরেছি। সে প্রণালী হচ্ছে ক্রমোন্নতি; অর্থাৎ যত দিন যাবে, তত সমস্ত জগতের, এবং তার অন্তর্ভূ্ত জীবজগতের এবং তার অন্তর্ভূ্ত মানবসমাজের, এবং তার অন্তর্ভূ্ত প্রতি মানবের, উন্নতি অনিবার্য্য। প্রকৃতির ধর্ম্মই হচ্ছে আমাদের উন্নতি সাধন করা। সুতরাং আমাদের তার জন্য নিজের কোনও চেষ্টার আবশ্যক নেই। আমরা শুয়েই থাকি আর ঘুমিয়েই থাকি, জাগতিক নিয়মের বলে আমাদের উন্নতি হবেই। এই কারণেই এই ক্রমোন্নতিবাদ-আকারে ইভলিউসন আমাদের স্বাভাবিক জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার অনুকূল মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এই 'ক্রম' শব্দটি আমাদের মনের উপর এমনি আধিপত্য স্থাপন করেছে যে,

সেটিকে অতিক্রম করা পাপের মধ্যে গণ্য হ'য়ে পড়েছে। তাই আমরা নানা কাজের উপক্রমণিকা করে'ই সন্তুষ্ট থাকি, কোন বিষয়েরই উপসংহার করাটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিনে; প্রস্তাবনাতেই আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হ'য়ে যায়। কিন্তু আসলে ইভলিউসন ক্রম-বিকাশও নয়, ক্রমোন্নতিও নয়। কোনও পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড়প্রকৃতির নেই, এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। ইভলিউসন জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম্ম। ইভলিউসনের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট। ইভলিউসন অর্থে দৈব নয়,—পুরুষকার। তাই ইভলিউসনের জ্ঞান মানুষকে অলস হ'তে শিক্ষা দেয় না, সচেষ্ট হ'তে শিক্ষা দেয়। আমরা ভুল তর্জ্জমা করে' ইভলিউসনকে আমাদের চরিত্র-হীনতার সহায় করে' এনেছি।

ইউরোপীয় সভ্যতার হয় আমরা তর্জ্জমা করতে কৃতকার্য্য হচ্ছি নে, নয় ভুল তর্জ্জমা করছি, তাই আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে' নব্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হ'য়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত সে বিষয়ে লক্ষ্য না করে' জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে' থাকতুম, তা হ'লে

জনসাধারণের মধ্যে আমরা নব প্রাণের সঞ্চারও কর্‌তে পার্‌তুম। আমরা অধ্যয়ন করে' যা লাভ করেছি, তা অধ্যাপনার দ্বারা দেশশুদ্ধ লোককে দিতে পার্‌তুম। আমরা আমাদের Cultureকে nationalise কর্‌তে পারিনি বলেই, গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আইনের দ্বারা বাধ্য করে' জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হোক্। মান্যবর শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনও মনোভাব নেই। তাই গবর্ণমেণ্টকে ভজা-বার জন্য, দিবারাত্রি খালি বিলেতী নজিরই দেখানো হচ্ছে। শিক্ষা শব্দের অর্থ শুধু লিখ্‌তে ও পড়্‌তে শেখা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গবর্ণমেণ্টই স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে' আমাদের লিখ্‌তে পড়্‌তে শিখিয়েছেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকেই গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করে' রাজ্যিশুদ্ধ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে, এই হচ্ছে আমাদের হাল রাজনৈতিক আবদার। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের নব-শিক্ষা মজ্জাগত কর্‌তে না পার্‌ব, ততদিন জনসাধারণকে পড়্‌তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে, তা ঠিক বোঝা যায় না। আমরা আজ পর্য্যন্ত ছোট ছেলেদের উপযুক্ত একখানিও পাঠ্য পুস্তক রচনা কর্‌তে পারিনি। পড়্‌তে শিখ্‌লে, এবং পড়্‌বার অবসর থাক্‌লে এবং বই কেন্‌বার সঙ্গতি থাক্‌লে, প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষার ছেলেরা সেই রামায়ণ মহাভারতই পড়্‌বে,—আমাদের নব-শিক্ষার ভাগ তারা কিছু পাবে না। রামায়ণ মহাভারতের

বইয়ের ব্যবসা

সাধারণতঃ লোকের একটা বিশ্বাস আছে যে, বই জিনিসটা পড়া সহজ, কিন্তু লেখা কঠিন। অপর দেশে যাই হোক্, এ দেশে কিন্তু নিজে বই লেখার চাইতে অপরকে পড়ানো ঢের বেশী শক্ত। শুন্‌তে পাই যে, কোন বইয়ের এক হাজার কপি ছাপালে, এক বৎসরে তার একশ'ও বিক্রী হয় না। সাধারণ লেখকের কথা ছেড়ে দিলেও, নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কাটে কম, কাটে বেশী পোকায়। বাঙ্গলাদেশে লেখকের সংখ্যা বেশী কিংবা পাঠকের সংখ্যা বেশী, বলা কঠিন। এ বিষয়ে যখন কোন statistics পাওয়া যায় না, তখন ধরে' নেওয়া যেতে পারে যে মোটামুটি দুই সমান। কেউ কেউ এমন কথাও বলে' থাকেন, যে লেখা ও পড়া এ দুটি কাজ অনেক স্থলে একই লোকে করে' থাকেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে অধিকাংশ লেখকের পক্ষে নিজের লেখা নিজে পড়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কেননা পরের বই কিন্‌তে পয়সা লাগে, কিন্তু নিজের বই বিনে পয়সায় পাওয়া যায়। অবশ্য কখন কখন কোনও কোনও বই উপহারস্বরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব বই প্রায়ই অপাঠ্য। এরূপ অবস্থায় বঙ্গ-সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হওয়া প্রায় একরূপ অসম্ভব। কারণ, সাহিত্য পদার্থটি যাই হোক্ না কেন, বই হচ্ছে শুধু বেচাকেনার জিনিস, একেবারে

কাঁচামাল। ও মাল ধরে' রাখা চলে না। গাছের পাতার মত বইয়ের পাতাও বেশী দিন টেঁকে না, এবং একবার ঝরে' গেলে উনুন ধরানো ছাড়া অন্য কোনও কাজে লাগে না।

এ অবস্থা যে সাহিত্যের পক্ষে শোচনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কার দোষে যে এরূপ অবস্থা ঘটেছে, লেখকের কি পাঠকের, সে কথা বলা কঠিন। অবশ্য লেখকের পক্ষে এই বল্‌বার আছে যে, এক টাকা দিয়ে একখানি বই কেনার চাইতে, একশ' টাকা দিয়ে একখানি বই ছাপানো ঢের বেশী কষ্টসাধ্য। অপর পক্ষে পাঠক বল্‌তে পারেন যে, একশটি টাকা অন্ততঃ ধার করেও যে-সে বাঙ্গালা বই ছাপানো যেতে পারে, কিন্তু নিজের বুদ্ধি অপরকে ধার না দিয়ে যে-সে বাঙ্গলা বই পড়া যেতে পারে না। অর্থকষ্টের চাইতে মনঃকষ্ট অধিক অসহ্য। আমার মতে দু'পক্ষের মত এক হিসেবে সত্য হ'লেও আর এক হিসেবে মিথ্যা। বই লিখ্‌লেই যে ছাপাতে হবে, এইটি হচ্ছে লেখকদের ভুল; আর বই কিন্‌লেই যে পড়্‌তে হবে, এইটি হচ্ছে পাঠকদের ভুল। বই লেখা জিনিসটা একটা সখ মাত্র হওয়া উচিত নয়,—কিন্তু বই কেনাটা সখ ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়।

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে আমি কোন আলোচনা করতে চাইনে। কারণ, সাহিত্য শব্দ উচ্চারণ কর্‌বামাত্র নানা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। অমনি চারধার থেকে এই দার্শনিক প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্য কাকে

বলে? সাহিত্যে কার কি ক্ষতি হয় এবং কার কিঁ উপকার হয়? তারপর সাহিত্যকে সমাজের শাসনাধীন করে', তার শাস্তির জন্য সমালোচনার দণ্ডবিধি আইন গড়্‌বার কথা হয়। সমালোচকেরা একধারে ফরিয়াদি, উকিল, বিচারক এবং জল্লাদ হ'য়ে ওঠেন। সুতরাং কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সাহিত্য যে কি, সে সম্বন্ধে যখন এখনও একটা জাতীয় ধারণা জন্মে যায়নি, তখন এ বিষয়ে এক কথা বল্‌লে হাজার কথা শুন্‌তে হয়। কিন্তু বই জিনিসটা কি, তা সকলেই জানেন। এবং বাঙ্গলা বই যে বাজারে চলা উচিত সে বিষয়ে বোধ হয়—দু'মত নেই, কারণ ও জিনিসটা স্বদেশী শিল্প। যদি কারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তা হ'লে তা ভাঙ্গাবার জন্যে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, নব্য স্বদেশী শিল্পের যে দুটি প্রধান লক্ষণ, সে দুটিই এতে বর্ত্তমান। প্রথমতঃ নব্য-সাহিত্য পদার্থটা স্বদেশী নয়, দ্বিতীয়তঃ তাতে শিল্পের কোন পরিচয় নেই।

লেখা ব্যাপারটা যতদিন আমরা মানুষের একটা প্রধান কাজ হিসেবে না দেখে, বাজে সখ হিসেবে দেখ্‌ব, ততদিন বইয়ের ব্যবসা ভাল করে' চল্‌বে না। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি অর্থাৎ বিস্তার কর্‌তে হ'লে, আমাদের স্বীকার কর্‌তে হবে যে এ যুগে সাহিত্য প্রধানতঃ লেখা পড়ার জিনিস নয়, কেনা বেচার জিনিস। কোন রচনাকে যদি অপরে অমূল্য বলে, তা হ'লে রচয়িতার রাগ করা উচিত, কারণ যে পদার্থের মূল্য নেই, তা যত্ন করে' গড়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

বইয়ের ব্যবসা

ব্যবসার দুটি দিক আছে,—প্রথম production (তৈরি করা) দ্বিতীয়তঃ distribution (কাটানো)। মানবজীবনের এবং মালের জীবনের একই ইতিহাস, তার একটা আরম্ভ আছে, একটা শেষ আছে। যে তৈরি করে তার হাতে মালের জন্ম এবং যে কেনে তার হাতে তার মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন একটি মালকে দশ হাত ফিরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর নাম হচ্ছে distribution. সুতরাং বইয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দুটির প্রতিই আমাদের সমান লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।

এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, আমি সাহিত্য-ব্যবসায়ী নই। অর্থাৎ অদ্যাবধি বই আমি কিনেই আস্‌ছি, কখনও বেচিনি। সুতরাং কি কি উপায় অবলম্বন কর্‌লে বই বাজারে কাটানো যেতে পারে, সে বিষয়ে আমি ক্রেতার দিক্ থেকে যা বল্‌বার আছে, তাই বল্‌তে পারি, বিক্রেতা হিসেবে কোন কথাই বল্‌তে পারি নে।

সচরাচর দেখ্‌তে পাই যে, বই বিক্রী কর্‌বার জন্য, বিজ্ঞাপন দেওয়া, অৰ্দ্ধমূল্যে কিম্বা সিকিমূল্যে বিক্রী করা, ফাউ দেওয়া এবং উপহার দেওয়া প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে। এ সকল উপায়ে যে বইয়ের কাট্‌তির কতকটা সাহায্য করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে বাধাও যে দেয়, সে ধারণাটি বোধ হয় বিক্রেতাদের মনে তত স্পষ্ট নয়।

বীরবলের হালখাতা

প্রথমতঃ বিশখানি বইয়ের যদি এক সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এবং তার প্রতিখানিকেই যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তা হ'লে তার মধ্যে কোন্‌খানি যে কেনা উচিত, সে বিষয়ে অধিকাংশ পাঠক মন স্থির করে' উঠ্‌তে পারে না। অপরাপর মালের একটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ আছে। বিজ্ঞাপনেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে কোন্‌টি পয়লা নম্বরের, কোন্‌টি দোসরা নম্বরের, কোন্‌টি তেসরা নম্বরের ইত্যাদি; এবং সেই ইতরবিশেষ অনুসারে দামেরও তারতম্য হ'য়ে থাকে। সুতরাং সে সব মাল কিন্‌তে ক্রেতাকে বাঁশবনে ডোমকানা হ'তে হয় না, প্রত্যেকে নিজের অবস্থা এবং রুচি অনুসারে নিজের আবশ্যকীয় জিনিস কিন্‌তে পারে। কিন্তু বই সম্বন্ধে এরূপ শ্রেণীবিভাগ করে' বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব নয়; কেন না, যদিচ সাহিত্যে ভালমন্দের তারতম্য অগাধ, তবুও কোনও লেখক, তাঁর লেখা যে প্রথম শ্রেণীর নয়, এ কথা নিজমুখে সমাজের কাছে জাহির কর্‌বেন না। সুতরাং বিজ্ঞাপনের উপর আস্থা স্থাপন করে', হয় আমাদের বিশখানি বই একসঙ্গে কিন্‌তে হয়, নয় কেনা থেকে নিরস্ত থাক্‌তে হয়। ফলে দাঁড়ায় এই যে, বই বিক্রী হয় না,—কেননা যাঁর বিশখানি বই কেন্‌বার সঙ্গতি আছে, তাঁর বিশ্বাস যে সাহিত্য নিয়ে কারবার করে শুধু লক্ষ্মী-ছাড়ার দল।

অর্দ্ধমূল্যে এবং সিকিমূল্যে বিক্রী কর্‌বার দোষ যে, লোকের সহজেই সন্দেহ হয় যে, বস্তাপচা সাহিত্যই শুধু ঐ উপায়ে ঝেড়ে

ফেলা হয়। পয়সা খরচ করে' গোলামচোর হ'তে লোকের বড় একটা উৎসাহ হয় না।

কোন বই ফাউ হিসেবে দেবার আমি সম্পূর্ণ বিপক্ষে। আর পাঁচজনের বই লোকে পয়সা দিয়ে কিন্‌বে, এবং আমার বইখানি সেই সঙ্গে বিনে পয়সায় পাবে, এ কথা ভাব্‌তে গেলেও লেখকের দোয়াতের কালি জল হ'য়ে আসে। লেখকদের এইরূপ প্রকাশ্যে অপমান করে', সাহিত্যের মান কিম্বা পরিমাণ দুয়ের কোনটিই বাড়ানো যায় না। যদি কোন বই বিনামূল্যে বিতরণ কর্‌তেই হয়, ত প্রথম থেকে প্রথম সংস্করণ এইরূপ বিতরণ করা উচিত; যাতে করে' পাঠকদের সঙ্গে সহজে সে বইটির পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। উক্ত উপায়ে Tab সিগারেট এদেশে চালানো হয়েছে। প্রথমে কিছুদিন বিলিয়ে দিয়ে, তারপর দ্বিগুণ দাম চড়িয়ে সে সিগারেট আজকাল বাজারে বিক্রী করা হচ্ছে, এবং এত বিক্রী বোধ হয় অন্য কোনও সিগারেটের নেই। বই জিনিসটিকে ধূমপত্রের সঙ্গে তুলনা করাটাও অসঙ্গত নয়। কারণ অধিকাংশ বই, কাগজে-মোড়া ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যাই হোক্, আসল কথা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা লোকের মনে শুধু কেন্‌বার লোভ জন্মে দেওয়া যায়, কিন্তু কেনানো যায় না। কোন জিনিস কাউকে কেনাতে হ'লে, সেটি প্রথমতঃ তার হাতের গোড়ায় এগিয়ে দেওয়া চাই, তারপর সেটি তাকে গতিয়ে দেওয়া চাই। এ দুই বিষয়ে যে পুস্তক-বিক্রেতারা

বিশেষ কোন যত্ন করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস যে, নতুন বাঙ্গলা বই যদি ঘরে ঘরে ফেরি করে' বিক্রী হয়, তা হ'লে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়্‌বে।

সাহিত্যে production সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, demand-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্য supply কর্‌তে হবে। যে বই লোকে পড়্‌তে চায় না, সে বই অপর যে-কোন উদ্দেশ্যেই লেখা হোক্ না কেন, বেচ্‌বার উদ্দেশ্যে লেখা চলে না। এবং কি ধরণের বই লোকে পড়্‌তে চায়, সে বিষয়ে একটা সাধারণ কথা বলা যেতে পারে। এটি একটি প্রত্যক্ষ সত্য যে, সাধারণ পাঠক-সমাজ দুই শ্রেণীর বই পছন্দ করে না;—এক হচ্ছে ভাল, আর এক হচ্ছে মন্দ। যে বই ভালও নয় মন্দও নয়, অমনি একরকম মাঝামাঝি গোছের,—সেই বই মানুষে পড়্‌তে ভালবাসে, এবং সেইজন্য কেনে। প্রতি দেশে প্রতি যুগে প্রতি জাতির একটি বিশেষ সামাজিক বুদ্ধি থাকে। সে বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা, এবং সামাজিক জীবনের কাজেতেই সে বুদ্ধির সার্থকতা। কিন্তু সচরাচর লোকে সেই বুদ্ধির মাপকাটিতেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, আর্ট প্রভৃতি মনোজগতের পদার্থগুলোও মেপে নেয়। সে মাপে যে পদার্থটি ছোট সাব্যস্ত হয়, সেটিও যেমন গ্রাহ্য হয় না, তেমনি যেটি বড় সাব্যস্ত হয়, সেটিও গ্রাহ্য হয় না। সামাজিক বুদ্ধির সঙ্গে যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধি খাপে খাপে না মিলে যায়, তা হ'লে হয় তা অতিবুদ্ধি, নয় নির্বুদ্ধি এবং

এই উভয় শ্রেণীর বুদ্ধির সহিত সামাজিক মানব পারৎপক্ষে কোনরূপ সম্পর্ক রাখ্‌তে চায় না। এই কারণেই সাধারণতঃ লোকে নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি অবজ্ঞা এবং অতিবুদ্ধির প্রতি বিদ্বেষ-ভাব ধারণ করে। উঁচুদরের লেখক এবং নীচুদরের লেখক সমসাময়িক পাঠক-সমাজের কাছে সমান অনাদর পায়। কারণ, বুদ্ধি চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে লোক-সমাজ উঁচুতেও উঠ্‌তে চায় না, নীচুতেও নাম্‌তে চায় না,—যেখানে আছে সেইখানেই থাক্‌তে চায়। কেননা ওঠা এবং নামা দুটি ক্রিয়াই বিপজ্জনক। সমাজ 'বিষয়-বালিশে আলিস্' রেখে, নাটক নভেলের দর্পণে নিজের পোষাকী চেহারা দেখ্‌তে চায়, কবির মুখে নিজের স্তুতি শুন্‌তে ভালবাসে, এবং যে গুরুর কাছ থেকে নিজ মতের ভাষ্য লাভ করে, তাঁকেই দার্শনিক বলে' মান্য করে। প্রমাণ স্বরূপ দেখানো যেতে পারে, George Meredithএর অপেক্ষা Marie Corelliর নভেলের হাজার গুণ কাট্‌তি বেশী। এবং যে কবি সমাজের সুমনোভাব ব্যক্ত করেন, তাঁর চাইতে,—যিনি সমাজের কুমনোভাব ব্যক্ত করেন, তাঁর আদর কিছু কম নয়। Kipling-এর বই Tennysonএর বইএর চাইতে কম পয়সায় বিক্রী হয় না। সুতরাং সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পক্ষে ভাল বই লিখ্‌বার চেষ্টা কর্‌বার কোন দরকার নেই,—বই যাতে খারাপ না হয়, এই চেষ্টাটুকু কর্‌লেই কার্য্যোদ্ধার হবে। এবং কি ভাল আর কি মন্দ, তা নির্ণয় কর্‌তে সমাজের প্রচলিত মতামতগুলি আয়ত্ত করতে হবে। এক কথায়, ব্যবসা-

চালাতে হলে, যে রকমের সাহিত্য সমাজ চায়, তাই আমাদের যোগাতে হবে।

'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
ভারত যেমত চাহে, সেই খেলা খেল হে'

এরূপ অনুরোধ করে' যে কোন ফল নেই, তা স্বয়ং ভারতচন্দ্র টের পেয়েছিলেন,—আমরা ত কোন্ ছার। বাঙ্গলাদেশে কি রকমের বইয়ের সব চাইতে বেশী কাটৃতি, সেইটি জান্‌তে পার্‌লে, বাঙ্গালীজাতির মানসিক খোরাক যোগানো আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। শুন্‌তে পাই, বাজারে শুধু রূপকথা, রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান, এবং গল্পের বই কাটে। এ কথা যদি সত্য হয় ত, আমাদের স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, বালবৃদ্ধবনিতাতেই বাঙ্গলা বইয়ের ব্যবসা টিঁকিয়ে রেখেছে। আর এ কথা যে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার কোন কারণ নেই, কেননা মানুষ সব চাইতে ভালবাসে—গল্প। আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ঘটনাশূন্য, অর্থাৎ আমাদের বাহ্যিক কিম্বা মানসিক জীবনে কিছু ঘটে না। দিনের পর দিন আসে, দিন যায়। আর সে সব দিনও একটি অপরটির যমজ ভ্রাতার ন্যায়। বিশেষতঃ এ দেশে যেমন রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তেমনি আমরা না জন্মাতেই আমাদের জীবনের ইতিহাস সমাজ কর্ত্তৃক লিখিত হ'য়ে থাকে। আমরা শুধু চিরজীবন তার আবৃত্তি করে' যাই। সেই আবৃত্তির এখানে ওখানে ভুলভ্রান্তিটুকুতেই পরস্পরের ভিতর যা বৈচিত্র্য। কিন্তু

যন্ত্রবৎ চালিত হ'লেও, মানুষ এ কথা একেবারে ভুলে' যায় না যে, তারা কলের পুতুল নয়,—ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব। তাই নিজের জীবন ঘটনাশূন্য হ'লেও, অপর লোকের ঘটনাপূর্ণ জীবনের ইতিহাস চর্চ্চা করে' মানুষ সুখ পায়। অনুরূপ অবস্থায় পড়্লে নিজের জীবনও নিতান্ত একঘেয়ে না হ'য়ে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ হ'তে পার্‌ত—এই মনে করে' আনন্দ অনুভব করে। মানুষের উপবাসী হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাবার প্রধান সামগ্রী হচ্ছে গল্প,—তা সত্যই হোক্ আর মিথ্যাই হোক্। স্ত্রী সংগ্রহ কর্‌বার জন্য আমাদের ধনুর্ভঙ্গও কর্‌তে হয় না, লক্ষ্যভেদও কর্‌তে হয় না,—সেই জন্যই আমরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর এবং রামচন্দ্রের বিবাহের কথা শুন্‌তে ভালবাসি। আমাদের বাড়ীর ভিতর 'কুন্দ'ও ফোটে না, এবং বাড়ীর বাহিরে 'রোহিণী'ও জোটে না,—তাই আমরা 'বিষবৃক্ষ' ও 'ভ্রমর' একবার পড়ি, দুবার পড়ি, তিনবার পড়ি। আমরা দশটায় আপিস যাই, এবং পাঁচটায় ঠিক সেই একই পথ দিয়ে হয় গাড়ীতে, নয় ট্রামে, নয় পদব্রজে বাড়ী ফিরে আসি; তাই আমরা কল্পনায় সিন্ধবাদের সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরে' বেড়াতে ভালবাসি।

তা হ'লে স্থির হ'ল এই যে, আমাদের প্রধান কার্য্য হবে গল্প বলা,—শুধু নভেল-নাটকে নয়, সকল বিষয়ে। ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস,—যত উপন্যাসের মত হবে, ততই লোকের মনঃপূত হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, গল্প যত পুরোনো হয়, ততই সমাজের প্রিয় হ'য়ে ওঠে। প্রমাণ, রূপকথা এবং

রামায়ণ মহাভারতের কথা। এর কারণও স্পষ্ট। পুরোনোর প্রধান গুণ যে তা নতুন নয়, অর্থাৎ অপরিচিত নয়। নতুনের প্রধান দোষ যে, তা পরীক্ষিত নয়; সুতরাং তা সত্য কি মিথ্যা, উদ্ভাবনা কি আবিষ্কার, মানুষের পক্ষে শ্রেয় কি হেয়, তা একনজর দেখে' কেউ বল্‌তে পারেন না। তা ছাড়া নতুন কথা যদি সত্যও হয়, তা হ'লেও বিনা ওজরে গ্রাহ্য করা চলে না। মানুষের মন একটি হ'লেও, মনোভাব অসংখ্য। এবং সে মন যতই ছোট হোক্ না কেন, একাধিক মনোভাব তা'তে বাস করে। একত্রে বাস কর্‌তে হ'লে পরস্পর দিবারাত্র কলহ করা চলে না। তাই যে-সকল মনোভাব বহুকাল থেকে আমাদের মন অধিকার করে' বসে' আছে, তারা ঐ সহবাসের গুণেই পরস্পর একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়,—এবং সুখে না হোক্ শান্তিতে ঘর করে। কিন্তু নতুন সত্যের ধর্ম্মই হচ্ছে, মানুষের মনের শান্তিভঙ্গ করা। নতুন সত্য প্রবেশ করে'ই আমাদের মনের পাতা-ঘরকন্না কতকটা এলো-মেলো করে' দেয়। সুতরাং ও-পদার্থ মনের ভিতর ঢুক্‌লেই আমাদের মনের ঘর নতুন করে গোছাতে হয়, যে-সব মনো-ভাব তার সঙ্গে একত্র থাক্‌তে পারে না, তাদের বহিষ্কৃত করে' দিতে হয়, এবং বাদবাকীগুলিকে একটু বদ্‌লে সদ্‌লে নিয়ে তার সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে দিতে হয়। তা ছাড়া, নতুন সত্য মনে উদয় হ'য়ে অনেক নতুন কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্রেক করে। আমরা চির-পরিচিত কর্ত্তব্যগুলির দাবীই রক্ষে কর্‌তে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাই,

তারপর আবার যদি নিত্যনতুন কর্ত্তব্য এসে নতুন নতুন দাবী কর্‌তে আরম্ভ করে, তা হ'লে জীবন যে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে, তার আর সন্দেহ কি? মানুষে সুখ পায় না, তাই সোয়াস্তি চায়। যে লেখক পাঠকের মনের সেই সোয়াস্তিটুকু নষ্ট কর্‌তে ব্রতী হবেন, তাঁর প্রতি অধিকাংশ লোক বিমুখ ও বিরক্ত হবেন। সুতরাং 'সাবধানের মার নেই,' এই সূত্রের বলে যে লেখক, যে কথা সকলে জানে, সেই কথা গদ্যেপদ্যে অনর্গল বলে' যাবেন, বাজারে তাঁর কথার মূল্য হবে। উপরে যা বলা গেল, তার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, ব্যবসার হিসেবে সাহিত্যে গল্প বলা এবং পুরোনো গল্প বলাই শ্রেয়।

সাহিত্যের অবশ্য demand না বাড়্‌লে supply বাড়্‌বে না। সুতরাং সাহিত্যের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে পাঠকের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে, লেখকের কৃতিত্বের উপর নয়। এ দেশের শিক্ষিত লোকদের বই পড়া জিনিসটা বড় একটা অভ্যেস নেই। সাহিত্য-চর্চ্চা করাটা,—নিত্য নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য কোনরূপ কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নয়। এর বহুতর কারণ আছে, যথা,—অবসরের অভাব, অর্থের অভাব, এবং ফয়দার অভাব; কারণ সাহিত্য-চর্চ্চা কর্‌বার লাভটি কেউ টাকায় কষে' বার করে' দিতে পারেন না। যে বিদ্যে বাজারে ভাঙ্গানো যায় না, তার যে মূল্য থাক্‌তে পারে—এ বিশ্বাস সকলের নেই। কিন্তু স্কুলকলেজের বাইরে যে আমরা কোন বই পড়ি না, তার প্রধান কারণ,—স্কুলপাঠ্যপুস্তক পাঠ্য-পুস্তকের প্রধান শত্রু। বছর বছর

ধরে' স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থাবলী গলাধঃকরণ করে' যার মানসিক মন্দাগ্নি না জন্মায়, এমন লোক নিতান্ত বিরল। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাহিত্য-চর্চ্চা কর্‌বার উপদেশ দিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু বই কেনাটা যে একটি সখমাত্র হ'তে পারে, এবং হওয়া উচিত,—এই ধারণাটি আমি স্বদেশী সমাজের মনে জন্মিয়ে দিতে চাই।

বই গৃহসজ্জার একটি প্রধান উপকরণ, এবং সেই কারণে শুধু ঘর সাজাবার জন্যে আমাদের বই কেনা উচিত। আমরা যে হিসেবে ছবি কিনি এবং ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখি, সেই একই হিসেবে বই কেনা এবং ঘরে সাজিয়ে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ছবি পড়িনে বলে' ছবি কেনাটা যে অন্যায়, একথা কেউ বলেন না,—সুতরাং বই পড়িনে বলে' যে কিন্‌ব না, এরূপ মনোভাব অসঙ্গত। এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, বইয়ের মত ছবিও একটা পড়্‌বার জিনিস। ছবিরও একটা অর্থ আছে, একটা বক্তব্য কথা আছে। বইয়ের সঙ্গে ছবির একমাত্র তফাৎ হচ্ছে যে, উভয়ের ভাষা স্বতন্ত্র। যা একজন কালি ও কলমের সাহায্যে ব্যক্ত করেন, তাই অপর একজন রং ও তূলির সাহায্যে প্রকাশ করেন। তা ছাড়া, বাঙ্গলা বইয়ের সপক্ষে বিশেষ করে' এই বল্‌বার আছে যে, বাঙ্গালী ক্রেতা ইচ্ছে কর্‌লে তা পড়্‌তে পারেন,—কিন্তু ছবি জিনিসটা ইচ্ছে কর্‌লেও পড়্‌তে পারেন না।

সচরাচর লোকে ঘর সাজায়, গৃহের শোভা বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য নয়,—কিন্তু নিজের ধন এবং সুরুচির পরিচয় দেবার জন্য।

শেষোক্ত হিসেব থেকে দেখ্‌লেও দেখা যায় যে, বৈঠকখানার দেয়ালে হাজার টাকার একখানি নোট না ঝুলিয়ে, হাজার টাকা দামের একখানি ছবি ঝোলানতে যেমন অধিক সুরুচির পরিচয় দেয়, তেমনি নানা আকারের নানা বর্ণের রাশি রাশি বই সারি সারি সাজিয়ে রাখাতে প্রমাণ হয় যে, গৃহকর্ত্তা একাধারে ধনী এবং গুণী।

পূর্ব্বোক্ত কারণে আমি এদেশের ধনী লোকেদের বই কিন্‌তে অনুরোধ করি,—গিল্‌তে নয়। তাঁরা যদি এবিষয়ে একবার পথ দেখান, তা হ'লে তাঁদের দৃষ্টান্ত সদ্দৃষ্টান্ত হিসেবে বহুলোকে অনুসরণ করবে। যতদিন না বাঙ্গালী সমাজ নিজেদের পাঠক হিসেবে না দেখে,' পুস্তকক্রেতা হিসেবে দেখ্‌তে শিখ্‌বেন, ততদিন বঙ্গ-সাহিত্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে না।

আমার শেষ কথা এই যে, গ্রন্থক্রেতা যে শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকার করেন, তা নয়। চারিদিকে বইয়ের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে থাকাতে একটা উপকার আছে। বই চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবীতে চামড়ায়-ঢাকা মন নামক একটি পদার্থ আছে।

বৈশাখ, ১৩২০

বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ

নানারূপ গল্পপত্ত লিখ্‌বার এবং ছাপ্‌বার যতটা প্রবল ঝোঁক যত বেশী লোকের মধ্যে আজকাল এদেশে দেখা যায়, তা পূর্ব্বে কখনো দেখা যায় নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্ততঃ একখানি মাসিক পত্রের না আবির্ভাব হয়। এবং সে সকল মাসিক পত্রে সাহিত্যের সকলরকম মালমসলার কিছু না কিছু নমুনা থাকেই থাকে। স্থতরাং এ কথা অস্বীকার কর্‌বার যো নেই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নবযুগের শিশু-সাহিত্য আঁতুড়েই মর্‌বে, কিম্বা তার একশ' বৎসর পরমায়ু হবে,—সে কথা বল্‌তে আমি অপারগ। আমার এমন কোনও বিছে নেই, যার জোরে আমি পরের কুষ্ঠি কাট্‌তে পারি। আমরা সমুদ্রপার হ'তে যে-সকল বিদ্যার আমদানি করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার ভিতর পড়ে না। কিন্তু এই নব-সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তা হ'লে যুগধর্ম্মানুযায়ী সাহিত্য রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হ'য়ে আস্‌বে। পূর্ব্বোক্ত কারণে, নব্য লেখকেরা তাঁদের লেখায় যে হাত দেখাচ্ছেন, সেই হাত দেখ্‌বার চেষ্টা করাটা একেবারে নিষ্ফল না-ও হ'তে পারে।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নব-সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে' গণধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌ছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এদেশের

সাহিত্য-জগৎ যখন দু'চার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্, পড়্বার অধিকারও ছিল না,—তখন সাহিত্য-রাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ কর্‌তেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির, অট্টালিকা, স্তূপ, স্তম্ভ, গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে' তোলা অসম্ভব, এই জ্ঞানটুকু জন্মালে, আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাক্‌বে না, এবং শব্দের কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়্বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত কর্‌ব না। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ কর্‌বার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায়, সাহিত্য-জগতেরও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দূর থেকে দেখ্‌তে ভাল—কিন্তু নিত্যব্যবহার্য্য নয়।

দর্শনের কুতবমিনারে চড়্‌লে আমাদের মাথা ঘোরে, কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করা চলে না,—কেননা অত সৌন্দর্য্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্ম্মের পর্ব্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ানো যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়ালেই যে কোন অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেক্‌তে বাধ্য,—এ বিশ্বাসও আমাদের চলে' গেছে। পুরাকালে মানুষে যা-কিছু গড়ে' গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হ'তে আল্‌গা করা, দু'চারজনকে বহুলোক হ'তে বিচ্ছিন্ন করা। অপরপক্ষে নবযুগের ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও

ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়্তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হ'লে যে কোনও জিনিস মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই ; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্ত্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্ত্তিগুলি আকারে ছোট হ'য়ে আস্‌বে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে ; আকাশ আক্রমণ না করে' মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মত উঁচুর দিকে ঠেলে উঠ্‌বে না, ঘাসের মত চারিদিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায় বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে' গিয়ে, স্বল্পশক্তিশালী বহু সংখ্যক লেখকের দিন আস্‌ছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে' অন্ততঃ ষষ্ঠি সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাব্‌বার সময় নেই, ভাব্‌বার অবসর থাক্‌লেও লিখ্‌বার যথেষ্ট সময় নেই, লিখ্‌বার অবসর থাক্‌লেও লিখ্‌তে শিখ্‌বার অবসর নেই ; অথচ আমাদের লিখ্‌তেই হবে,—নচেৎ মাসিক পত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠাপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে' লিখ্‌তে না হ'লেও ঘড়ির উপর লিখ্‌তে হয় ; কেননা মাসিক পত্রের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, পয়লা বেরনো,— কি যে বেরলো, তাতে বেশী কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া, আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখ্‌তে হয়। নীতির জুতো-শেলাই থেকে ধর্ম্মের চণ্ডিপাঠ পর্য্যন্ত,—সকল ব্যাপারই আমাদের

সমান অধিকারভুক্ত। আমাদের নব-সাহিত্যে কোনরূপ 'শ্রম-বিভাগ' নেই—তার কারণ যে-ক্ষেত্রে 'শ্রম' নামক মূল পদার্থেরই অভাব, সেস্থলে তার বিভাগ আর কি করে' হ'তে পারে?

তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোট গল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

দেশকালপাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্রধর্ম্মাবলম্বী হ'য়ে উঠেছে, তার জন্য আমার কোনও খেদ নেই। এ কালের রচনা ক্ষুদ্র বলে' আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়,—তাহ'লে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হ'লেও চলে,—কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকেরা এই সত্যটি মনে রাখ্‌লে, গল্প স্বল্প হ'য়ে আস্‌বে, শোক শ্লোকরূপ ধারণ কর্‌বে, বিজ্ঞান বামনরূপ ধারণ করে'ও ত্রিলোক অধিকার করে' থাক্‌বে, এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে। যাঁরা মানসিক আরামের চর্চ্চা না করে' ব্যায়ামের চর্চ্চা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, যে-সাহিত্যে দম নেই, তাতে অন্ততঃ কস (grip) থাকা আবশ্যক।

২

বর্ত্তমান ইউরোপের সম্যক্ পরিচয়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, গণধর্ম্মের প্রধান ঝেঁাক হচ্ছে বৈশ্যধর্ম্মের দিকে; এবং সেই ঝোঁকটি না সাম্‌লাতে পার্‌লে সাহিত্যের পরিণাম অতি

ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে। আমাদের এই আত্মা-সর্ব্বস্ব দেশে লেখকেরা যে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন কর্‌বেন না, একথাও জোর করে' বলা চলে না। লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা কর্‌তে অনেকে প্রস্তুত, তার প্রমাণ 'ভ্যালুপেয়েব্‌ল্‌ পোষ্ট' নিত্য ঘরে ঘরে দিচ্ছে। আমাদের নব-সাহিত্যের যেন-তেন-প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি যদি দমন কর্‌তে না পারা যায়, তাহ'লে বঙ্গসরস্বতীকে যে পথে দাঁড়াতে হবে, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে, 'বাণিজ্যে বসতি সরস্বতী'। সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ কর্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লে—দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না। সাহিত্যের বাজার-দর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়্‌বে, সেই সঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আস্‌বে। স্থতরাং আমাদের নব-সাহিত্যে লোভ নামক রিপুর অস্তিত্বের লক্ষণ আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক,—কেননা শাস্ত্রে বলে 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'।

৩

এ যুগের মাসিক পত্রসকল যে সচিত্র হ'য়ে উঠেছে, সেটি যেমন আনন্দের কথা, তেমনি আশঙ্কারও কথা। ছবির প্রতি গণসমাজের যে একটি নাড়ীর টান আছে, তার প্রচলিত প্রমাণ হচ্ছে, মার্কিণ সিগারেট। ঐ চিত্রের সাহচর্য্যেই যত অচল সিগারেট বাজারে চলে' যাচ্ছে। এবং আমরা চিত্রমুগ্ধ হ'য়ে

মহানন্দে তাম্রকূট জ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যবসার একটা প্রধান অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলে-ভুলোনো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোন উন্নতি হবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে,—কেননা সমাজে গোলাম পাশ করে' দেওয়াতেই বণিকবুদ্ধির সার্থকতা; কিন্তু সাহিত্যের যে অবনতি হবে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। নর্ত্তকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারঙ্গীর মত, চিত্রকলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাব্যকলার অনুধাবন করাতে তার পদমর্য্যাদা বাড়ে না। একজন যা করে, অপরে তার দোষগুণ বিচার করে,—এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। সুতরাং ছবির পাশাপাশি তার সমালোচনাও সাহিত্যে দেখা দিতে বাধ্য। এই কারণেই, যেদিন থেকে বাঙ্গলাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা সুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে, সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। এই তর্কযুদ্ধে আমার কোন পক্ষ অবলম্বন করবার সাহস নেই। আমার বিশ্বাস, এদেশে একালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদগ্ধ্য এবং আলেখ্যব্যাখ্যানে নিপুণতা অতিশয় বিরল,—কারণ এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। তবে বঙ্গদেশের নব্যচিত্র সম্বন্ধে সচরাচর যে-সকল আপত্তি উত্থাপন করা হ'য়ে

থাকে, সেগুলি সঙ্গত কি অসঙ্গত তা বিচার কর্‌বার অধিকার সকলেরই আছে; কেননা সে সকল আপত্তি কলাজ্ঞান নয়, সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর আমি জানি, নব্য-চিত্রকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁদের রচনায় বর্ণে বর্ণে বানান-ভুল এবং রেখায় রেখায় ব্যাকরণ-ভুল দৃষ্ট হয়। এ কথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বল্‌তে পারেন, যাঁদের চিত্রকর্ম্মের ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে; কিন্তু সে ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশের রাস্তাঘাটে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, যদিচ ও-সকল স্থানে সমালোচকের দর্শন পাওয়া দুর্ল্লভ নয়। আসল কথা হচ্ছে, এ শ্রেণীর চিত্র-সমালোচকেরা অনুকরণ অর্থে ব্যাকরণ শব্দ ব্যবহার করেন। এঁদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এদেশের চিত্র-শিল্পীদের কর্ত্তব্য। প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাই বলে' তার অনুকরণ করাটাই যে পরম-পুরুষার্থ, এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার কর্‌তে পারি নে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিম্বা তার প্রতি-কৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্ত্তকীর মুখ দেখ্‌বার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়,—সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে, আমাদের মানস-

জ্ঞাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিকলি পরানো। আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনও অবসর নেই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্য-সামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মান্‌তে বাধ্য,—কিন্তু জ্যামিতি কিম্বা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমার পূর্ব্বোক্ত মতের যাথার্থ্যের প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যেতে পারে। একে একে যে দুই হয়, এবং একের পিঠে এক দিলে যে এগারো হয়,—বৈজ্ঞানিক হিসেবে এর চাইতে খাঁটি সত্য পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। অথচ একে একে দুই না হ'য়েও, এবং একের পিঠে একে এগারো না হ'য়েও, ঐরূপ যোগাযোগে যে বিচিত্র নক্সা হ'তে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচে দেওয়া যাচ্ছে।
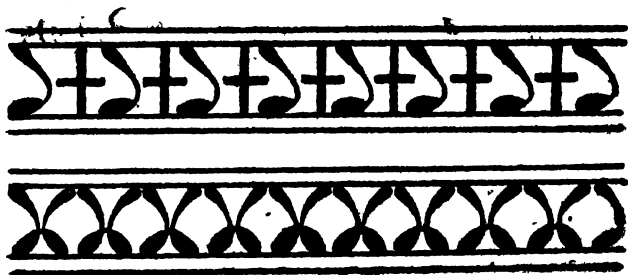
সম্ভবতঃ আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ এ কথা বল্‌তে পারেন যে, 'চিত্রে আমরা গণিতশাস্ত্রের সত্য চাইনে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই।' প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে

বীরবলের হালখাতা

মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে' আস্‌ছে, তার কারণ অন্ধের হস্তীদর্শন ন্যায়ে নির্ণীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যাঁর চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেইটুকুকেই সমগ্র সত্য বলে' ভুল করেন। সত্যভ্রষ্ট হ'লে বিজ্ঞানও হয় না, আর্টও হয় না,—কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। কোন সুন্দরীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসেবে সত্য, তার সৌন্দর্য্যও তেমনি আর এক হিসেবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য্য নামক সত্যটি তেমন ধরাছোঁওয়ার মত পদার্থ নয় বলে', সে সম্বন্ধে কোনরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখ্‌লে, নব্যশিল্পীর কৃশাঙ্গী মানসী-কন্যাদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্য অত ব্যগ্র হতুম না; এবং চিত্রের ঘোড়া ঠিক ঘোড়ার মত নয়, এ আপত্তিও উত্থাপন কর্‌তুম না। এ কথা বলার অর্থ,—তার অস্থিসংস্থান, পেশীর বন্ধন প্রভৃতি প্রকৃত ঘোড়ার অনুরূপ নয়। Anatomy অর্থাৎ অস্থিবিদ্যার সাহায্যে দেখানো যেতে পারে যে, চিত্রের ঘোটক, গঠনে ঠিক আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয়, এবং উভয়কে একত্রে জুড়িতে যোতা যায় না। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, অস্থিবিদ্যা কঙ্কালের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নয়। কঙ্কালের সঙ্গে সাধারণ লোকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই; কারণ দেহ-তাত্ত্বিকের জ্ঞাননেত্রে যাই হোক্, আমাদের চোখে প্রাণীজগৎ কঙ্কালসার

নয়। সুতরাং দৃষ্টজগৎকে অ-দৃষ্টের কষ্টিপাথরে কষে' নেওয়াতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু রূপজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না।—দ্বিতীয় কথা এই যে, কি মানুষ কি পশু, জীবমাত্রেরই দেহযন্ত্রগঠনের একমাত্র কারণ হচ্ছে উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করা। গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। ঘোড়ার দেহের বিশেষ গঠনের কারণ হচ্ছে, ঘোড়া তুরঙ্গম। যে ঘোড়া দৌড়বে না, তার anatomy ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোন বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে বোধ হয় কোন মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের anatomy ঠিক চড়্বার কিম্বা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তু-জ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। চলৎ-শক্তিরহিত অশ্ব,—অর্থাৎ যাকে চাবুক মার্‌লে ছিঁড়্বে কিন্তু নড়্বে না, এহেন ঘোটক,—অর্থহীন অনুকরণের প্রসাদেই জীবন্ত ঘোটকের অবিকল আকার ধারণ করে' চিত্রকর্ম্মে জন্মলাভ করে। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানস-প্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। তথাকথিত নব্যচিত্র যে নির্দ্দোষ কিম্বা নির্ভুল, এমন কথা আমি বলি না। যে বিদ্যা কাল জন্মগ্রহণ করেছে, আজ যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল সম্পূর্ণ আত্মবশে আস্‌বে, এরূপ আশা করাও বৃথা।

শিল্প হিসেবে তার নানা ত্রুটি থাকা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয়

নয়। কোথায় কলার নিয়মের ব্যভিচার ঘট্‌ছে, সমালোচকদের দেখিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। অস্থি নয়, বর্ণের সংস্থানে,—পেশী নয়, রেখার বন্ধনে,—যেখানে অসঙ্গতি এবং শিথিলতা দেখা যায়, সেই স্থলেই সমালোচনার সার্থকতা আছে। অধ্যবসায়ীর অযথা নিন্দায় চিত্রশিল্পীদের মনে শুধু বিদ্রোহীভাবের উদ্রেক করে, এবং ফলে তাঁরা নিজেদের দোষগুলিকেই গুণ ভ্রমে বুকে আঁক্‌ড়ে ধরে' রাখ্‌তে চান।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, চিত্র নয়। যেহেতু এ যুগের সাহিত্য চিত্রসনাথ হ'য়ে উঠেছে, সেই কারণেই চিত্র-কলার বিষয় উল্লেখ কর্‌তে বাধ্য হয়েছি। আমার ও-প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌বার অপর একটি কারণ হচ্ছে এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে, যা চিত্রকলায় দোষ বলে' গণ্য, তাই আবার আজকাল এদেশে কাব্যকলায় গুণ বলে' মান্য।

প্রকৃতির সহিত লেখকের যদি কোনরূপ পরিচয় থাক্‌ত, তাহ'লে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা কর্‌লেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্মাত না,—এবং যে বস্তু কখনও তাঁদের চর্ম্মচক্ষুর পথে উদয় হয়নি, তা অপরের মনশ্চক্ষুর সুমুখে খাড়া করে' দেবার চেষ্টারূপ পণ্ডশ্রম তাঁরা কর্‌তেন না। সম্ভবতঃ এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তু, আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্য মন—সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্র-কলায় অর্জ্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জ্জনীয়। সাহিত্যে সেহাই-কলমের কাজ কর্‌তে গিয়ে যাঁরা শুধু কলমের কালি ঝাড়েন—

তাঁরাই কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাটিকে সত্য বলে' গ্রাহ্য করেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চাল্‌শে-ধরা নয়। দেহের নবদ্বার বন্ধ করে' দিলে, মনের ঘর অলৌকিক আলোকে কিম্বা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে—বলা কঠিন। কিন্তু সর্ব্বলোকবিদিত সহজ সত্য এই যে, যাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয়—কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার অপপ্রয়োগে যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হ'য়ে কানা হয়েছে, তাঁরাই কেবল এ সত্য মান্‌তে নারাজ হবেন। প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ কর্‌বার, বাছাই কর্‌বার, এবং ভাষায় সাকার করে' তোল্‌বার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি। বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি ভাস বলেছেন যে, 'সুনিবিষ্ট লোকের রূপ বিপর্য্যয়' করা অন্ধকারের ধর্ম্ম। সাহিত্যে ওরূপ করাতে প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ প্রতিভার ধর্ম্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা,—প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে অপ্রকৃত, অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা, কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে' থাকে, তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময়ে কাব্য নয়। আলঙ্কারিকেরা উদাহরণ স্বরূপ দেখান যে, 'গৌ তৃণং আত্তি' কথাটা সত্য হ'লেও, ও কথা

বলায় কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই বলে' 'গরুরা ফুলে ফুলে মধুপান কর্‌ছে' এরূপ কথা বলাতে, কি বস্তুজ্ঞান কি রসজ্ঞান, কোনরূপ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এস্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, নিজেদের সকলপ্রকার ত্রুটির জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দায়ী করা, বর্ত্তমান ভারতবাসীদের একটা রোগের মধ্যে হ'য়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এ বিশ্ব নশ্বর এবং মায়াময় বলে', আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাহ্য-জগতের কোনরূপ খোঁজখবর রাখ্‌তেন না। কিন্তু এ কথা জোর করে' বলা যেতে পারে যে, তাঁরা কস্মিনকালেও অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে' ভুল্ করেন নি, কিম্বা একলম্ফে যে মনের পূর্ব্বোক্ত প্রথম অবস্থা হ'তে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়—এরূপ মতও প্রকাশ করেন নি। বরং শাস্ত্র এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হ'লে, কারও পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের অধিকার জন্মায় না, কেননা বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। আসল কথা হচ্ছে, মানসিক আলস্যবশতঃই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁক্‌তে পারিনে, তার একমাত্র কারণ—আমাদের চোখ ফোট্‌বার আগে মুখ ফোটে।

একদিকে আমরা বাহ্য বস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপর দিকে অহংয়ের প্রতি ঠিক তেমনি অনুরক্ত; আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের মনে যে সকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয়, তা এতই অপূর্ব্ব এবং মহার্ঘ্য যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারত-

বর্ষের আর দৈন্য ঘুচ্‌বে না। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে ভাবপ্রকাশ কর্‌তে প্রস্তুত; ঐ ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশী হোক্ না, অপরের কাছে তার যা কিছু মূল্য, সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে' একটুখানি ভাষায় পরিণত না হ'লে, রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তাহ'লে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হ'য়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হ'তে ভ্রষ্ট হতুম না। মানুষ মাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়—এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির কর্‌বার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে' বাদক হিসেবে দেখেন,—তাহ'লে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ কর্‌বার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়। এবং যে মুহূর্ত্ত থেকে কবিরা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখ্‌বেন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। তখন আর নিজের ভাববস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে কর্‌বেন না যে, সেটিকে আকার দেবার পরিশ্রম থেকে বিমুখ হবেন। অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিস নয়, একথা গণধর্ম্মাবলম্বীরা সহজে মান্‌তে চান

না,—এই কারণেই এত কথা বলা। আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে, তার উদ্ধার সাধন করতে হ'লে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হ'লে, সাধনার আবশ্যক; এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, দেহমনকে বাহ্য-জগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা। যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্য্যের দর্শন লাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতা লাভের জন্য অন্য-মনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন দেশী বিলেতি কোনরূপ বুলির বশবর্ত্তী না হ'য়ে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক্, অন্ততঃ নিজের উপকার করা হবে।

আশ্বিন, ১৩২০

নোবেল প্রাইজ

সব জিনিসেরই দুটি দিক আছে—একটি সদর, আর একটি মফঃস্বল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Nobel Prize পেয়েছেন বলে' বহুলোক যে খুসি হয়েছেন, তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে ;—কিন্তু সকলে যে সমান খুসি হন্‌নি, এ সত্যটি তেমন প্রকাশ হ'য়ে পড়েনি। এই বাঙ্গলাদেশের একদল লোকের, অর্থাৎ লেখকসম্প্রদায়ের, এ ঘটনায় হরিষে বিষাদ ঘটেছে। আমি একজন লেখক, সুতরাং কি কারণে ব্যাপারটি আমাদের কাছে গুরুতর বলে' মনে হচ্ছে, সেই কথা আপনাদের কাছে নিবেদন কর্‌তে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ, যখন একজন বাঙ্গালী লেখক এই পুরস্কার লাভ করেছেন, তখন আর একজনও যে পেতে পারে,—এই ধারণা আমাদের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়েছে যে, তা উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে গেলে আমাদের বুক ফেটে যাবে। অবশ্য আমরা কেউ রবীন্দ্র-নাথের সমকক্ষ নই, বড় জোর তাঁর স্বপক্ষ কিম্বা বিপক্ষ,—তাই বলে' পড়্‌তাটা যখন এদিকে পড়েছে, তখন আমরা যে Nobel Prize পাব না—এ হ'তে পারে না। সাহিত্যের রাজটীকা লাভ করা যায়—কপালে। তাই বলছি আশার আকাশে দোদুল্যমান

এই টাকার থলিটি চোখের স্মুখে থাকাতে, লেখা জিনিসটা আমাদের কাছে অতি স্নকঠিন হ'য়ে উঠেছে।

স্বর্গ যদি অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ হয়, আর তার লাভের সম্ভাবনা নিকট হ'য়ে আসে, তাহ'লে মানুষের পক্ষে সহজ মানুষের মত চলাফেরা করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। চলাফেরা দূরে যাক্, তার পক্ষে পা ফেলাই অসম্ভব হয়,—এই ভয়ে, পাছে হাতের স্বর্গ পায়ে ঠেলি। তেমনি Nobel Prizeএর সাক্ষাৎ পাওয়া অবধি, লেখা সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞান আমাদের এত বেড়ে গেছে যে, আমরা আর হাল্‌কাভাবে কলম ধর্‌তে পারি নে।

এখন থেকে আমরা প্রতি ছত্র Swedish Academyর মুখ চেয়ে লিখ্‌তে বাধ্য। অথচ যে দেশে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত, সে দেশের লোকের মন যে কি করে' পাব, তাও বুঝ্‌তে পারি নে। এইটুকু মাত্র জানি যে, আমাদের রচনায় অর্দ্ধেক আলো আর অর্দ্ধেক ছায়া দিতে হবে, কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে, তার হিসেব কে বলে' দেয়? Sweden যদি বারোমাস রাতের দেশ হ'ত, তাহ'লে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উপর কালির পোঁচ্‌ড়া দিয়ে যেতে পার্‌তুম; আর যদি বারো-মাস দিনের দেশ হ'ত, তাহ'লেও নয় ভরসা করে' সাদা কাগজ পাঠাতে পার্‌তুম। কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ হওয়াতেই আমরা উভয় সঙ্কটে পড়েছি।

দ্বিতীয় মুস্কিলের কথা এই যে, অদ্যাবধি বাঙ্গলা আর বাঙ্গালী ভাবে লেখা চল্‌বে না। ভবিষ্যতে ইংরেজি তরজমার

দিকে এক নজর রেখে,—এক নজর কেন, পূরো নজর রেখেই—আমাদের বাঙ্গলা-সাহিত্য গড়্‌তে হবে। অবশ্য আমরা সকলেই দোভাষী, আর আমাদের নিত্য কাজই হচ্ছে তরজমা করা। কিন্তু সব্যসাচী হ'লেও, এক তীরে দুই পাখী মেরে উঠ্‌তে পারি নে। আমরা যখন বাঙ্গলা লিখি, তখন ইংরেজির তরজমা করি,—কিন্তু সে না জেনে; আর যখন ইংরেজি লিখি, তখন বাঙ্গলার তরজমা করি,—সেও না জেনে। কিন্তু এখন থেকে ঐ কাজই আমাদের সজ্ঞানে কর্‌তে হবে—মুস্কিল ত ঐখানেই। মনোভাবকে প্রথমে বাঙ্গলা ভাষার কাপড় পরাতে হবে, এই মনে রেখে যে আবার তাকে সে কাপড় ছাড়িয়ে ইংরেজি পোষাক পরিয়ে Swedish Academyর সুমুখে উপস্থিত কর্‌তে হবে। এবং এর দরুণ মনোভাবটীর চেহারাও এমনি ত'য়ের কর্‌তে হবে যে, শাড়ীতেও মানায়, gownএও মানায়।

এক ভাষাতে চিন্তা করাই কঠিন, কিন্তু একসঙ্গে, যুগপৎ, দুটি ভাষাতে চিন্তা করাটা অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কায়ক্লেশে আমাদের সেই অসাধ্য সাধন কর্‌তেই হবে। একটি বাঙ্গালী আর একটি বিলেতি—এই দুটি স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতা যে আরামের নয়, তা যাঁরা ভুক্তভোগী নন তাঁরাও জানেন। তা ছাড়া, এ উভয়ের প্রতি সমান আসক্তি না থাকলে, এ দুই সংসার করাও মিছে। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি চাই কি মানুষের হ'তেও পারে, কিন্তু দুটি পত্নীতে সমান অনুরাগ হওয়া

অসম্ভব,—কেননা মানুষের চোখ দুটি হ'লেও, হৃদয় শুধু একটি। স্ত্রৈণ হ'তে হ'লে একটিমাত্র স্ত্রী চাই। এমন কি, দুই দেবীকে পূজা করতে হ'লেও, পালা করে' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, বছরে অর্দ্ধেক সময় আমাদের বাঙ্গলা লিখতে হবে, আর অর্দ্ধেক সময় ইংরেজিতে তার তরজমা করতে হবে। ফিরেফিরতি সেই Swedenএর কথাই এল। অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ছ'মাস রাত আর ছ'মাস দিনের সৃষ্টি করতে হবে, অথচ দৈবশক্তি আমাদের কারও নেই।

তৃতীয় মুস্কিল এই যে, সে তরজমার ভাষা চলতি হ'লে চলবে না। সে ভাষা ইংরেজি হওয়া চাই, অথচ ইংরেজের ইংরেজি হ'লেও হবে না। দেশী আত্মা এমনিভাবে বিলেতি দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া চাই, যাতে তার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারটুকু বজায় থাকে। ফুল ফোটাতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার গায়ে গন্ধ থাকা চাই দেশী কুঁড়ির। প্রজাপতি ওড়াতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার গায়ে রং থাকা চাই দেশী পোকার। এক কথায়, আমাদের পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ওঠাতে হবে। এহেন অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিদ্যা অবশ্য আমাদের নেই।

কাজেই যে কার্য্য আমরা একদিন বাঙ্গলায় করতে চেষ্টা করে' অকৃতকার্য্য হয়েছি—রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ— তাই আবার দোকর করে' ইংরেজিতে করতে হবে। ইউরোপে আসল জিনিসটি গ্রাহ্য হচ্ছে বলে' নকল জিনিসটিও যে গ্রাহ্য হবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। ইউরোপ এদেশে মেকি চালায়

বলে', আমরাও যে সে দেশে মেকি চালাতে পার্‌ব—এমন ভরসা আমার নেই।

ফলে আমরা সাদাকে কালো, আর কালোকে সাদা যতই কেন করি নে,—আমাদের পক্ষে Nobel Prize ছিকেয় তোলা রইল। কিন্তু যদি পাই? বিড়ালের ভাগ্যে সে ছিকে যদি ছেঁড়ে! সেও আবার বিপদের কথা হবে। Nobel Prize পাওয়ার অর্থ শুধু অনেকটা টাকা পাওয়া নয়, সেই সঙ্গে অনেকখানি সম্মান পাওয়া। অনর্থ এ ক্ষেত্রে অর্থ নয়, কিন্তু তৎ-সংসৃষ্ট গৌরবটুকু। বাঙ্গলা লিখে আমরা কি অর্থ কি গৌরব, কিছুই পাই নে। বাঙ্গলা-সাহিত্যে আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই, এবং পুরস্কারের মধ্যে লাভ করি তার চাট্টুকু। স্বদেশীর শুভ-ইচ্ছার ফুলচন্দন কালেভদ্রেও আমাদের কপালে জোটে না বলে', ইউরোপ যদি উপযাচী হ'য়ে আমাদের মাথায় সাহিত্যের ভাইফোঁটা দেয়, তাহ'লে তার ফলে আমাদের আয়ুর্বৃদ্ধি না হ'য়ে হ্রাস হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

প্রথমেই দেখুন যে, Nobel Prizeএর তারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শত শত চিঠি পাব। এবং এই অসংখ্য চিঠি পড়্‌তে এবং তার উত্তর দিতেই আমাদের দিন কেটে যাবে,—সাহিত্য পড়্‌বার কিম্বা গড়্‌বার অবসর আর আমাদের থাক্‌বে না। এই কারণেই বোধহয় লোকে বলে যে, Nobel Prize লাভ করার অর্থ হচ্ছে সাহিত্যজীবনের মোক্ষলাভ করা।

আর এক কথা, টাকাটা অবশ্য ঘরে তোলা যায় এবং দিব্য আরামে উপভোগ করা যায়, কিন্তু গৌরব জিনিসটা ওভাবে আত্মসাৎ করা চলে না। দেশশুদ্ধ লোক সে গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে অধিকারী। শাস্ত্রে বলে 'গৌরবে বহুবচন।' কিন্তু তার কত অংশ নিজের প্রাপ্য, আর কত অংশ অপরের প্রাপ্য,—সে সম্বন্ধে কোন একটা নজির নেই বলে', এই গৌরব-দায়ের ভাগ নিয়ে স্বজাতির সঙ্গে একটা জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অপরপক্ষে যদি একের সম্মানে সকলে সমান সম্মানিত জ্ঞান করেন, এবং সকলের মনে কবির প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে—তাতেও কবির বিপদ আছে। ত্রিশ দিন যদি বিজয়াদশমী হয়, এবং ত্রিশকোটী লোক যদি আত্মীয় হ'য়ে ওঠেন, তাহ'লে নররূপধারী একাধারে তেত্রিশকোটি দেবতা ছাড়া আর কারও পক্ষে অজস্র কোলাকুলির বেগ ধারণ করা অসম্ভব। ও অবস্থায় রক্তমাংসের দেহের মুখ থেকে সহজেই এই কথা বেরিয়ে যায় যে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।' এবং ও-কথা একবার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেলে, তার ফলে কবিকে কেঁদে মর্‌তে হবে।

তাই বলি, আমাদের বাঙ্গালী লেখকদের পক্ষে Nobel Prize হচ্ছে দিল্লীর লাড্ডু,—যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ওভি পস্তায়া!

মাঘ, ১৩২০

সবুজ পত্র

বাঙ্গলা দেশ যে সবুজ, এ কথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার করবেন না। মা'র শস্যশ্যামলরূপ বাঙ্গলার এত গদ্যেপদ্যে এতটা পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে যে, সে বর্ণনার যাথার্থ্য বিশ্বাস করবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক নেই। পুনরুক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর সত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষুকর্ণের যে বিবাদ হ'তে পারে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না। এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশতঃ নাম ও রূপের বাস্তবিকই কোন বিরোধ নেই। একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, তরাই হ'তে সুন্দরবন পর্য্যন্ত, এক ঢালা সবুজবর্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে। কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথাও তার বিরাম নেই ;—শুধু তাই নয়, সেই রং বাঙ্গলার সীমানা অতিক্রম করে', উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে, ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে।

সবুজ, বাঙ্গলার শুধু দেশজোড়া রং নয়,—বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফুলের জহরতে আপাদমস্তক সালঙ্কারা হ'য়ে দেখা দেয় না ; বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হ'য়ে শরতের পূজার তসর ধারণ করে' আসে না,

শীতে বিধবার মত সাদা শাড়ীও পরে না। মাধব হতে মধু পর্য্যন্ত ঐ সবুজের টানা স্বর চলে; ঋতুর প্রভাবে সে স্বরের যে রূপান্তর হয়, সে শুধু কড়ি কোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফুলে ও ফলে, আমরা বর্ণগ্রামের সকল স্বরেরই খেলা দেখ্‌তে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফুলের রং ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃতির ও-সকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবুজে। পাঁচরঙা ব্যভিচারী-ভাবসকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ড-হরিৎ স্থায়ী-ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।

এরূপ হবার অবশ্য একটা অর্থ আছে। বর্ণমাত্রেই ব্যঞ্জন বর্ণ,—অর্থাৎ বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্য-বস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়, কিন্তু সেই সুযোগে নিজেকেও ব্যক্ত করা। যা স্বপ্রকাশ নয়, তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। তাই রং রূপও বটে, রূপকও বটে। যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায়, ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না, এবং আমরা তার বক্তব্য কথা বুঝ্‌তে পারিনে। বাঙ্গলার সবুজ পত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে, তা পড়্‌বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই—কারণ সে লেখার ভাষা বাঙ্গলার প্রাকৃত। তবে আমরা সকলে যে তার অর্থ বুঝ্‌তে পারিনে, তার কারণ হচ্ছে যিনি গুপ্ত জিনিস আবিষ্কার করতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিস তাঁর চোখে পড়ে না।

যাঁর ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে আর তার জন্ম-কথা জানা আছে, তিনিই জানেন যে, সূর্য্যকিরণ নানা বর্ণের একটি সমষ্টি মাত্র, এবং শুধু সিধে পথেই সে সাদা ভাবে চল্‌তে পারে। কিন্তু তার সরল গতিতে বাধা পড়্‌লেই, সে সমষ্টি ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, বক্র হ'য়ে বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করে, এবং তার বর্ণ-সকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হ'য়ে যায়। সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি। এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে' থাকে। বেগুনী কিশলয়ের রং,—জীবনের পূর্ব্বরাগের রং। লাল রক্তের রং,—জীবনের পূর্ণরাগের রং। নীল আকাশের রং,—অনন্তের রং। পীত শুষ্কপত্রের রং,—মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং,—রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্ব্ব সীমায় বেগুনী আর পশ্চিম সীমায় লাল। অস্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের, অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম্ম।

যে বর্ণ বাঙ্গলার ওষধিতে ও বনস্পতিতে নিত্য বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, নিশ্চয় সেই একই বর্ণ আমাদের হৃদয় মনকেও রঙ্গিয়ে রেখেছে। আমাদের বাহিরের প্রকৃতির যে রং, আমাদের অন্তরের পুরুষেরও সেই রং। এ কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে, সজীবতা ও সরসতাই হচ্ছে বাঙ্গালীর মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। প্রমাণ স্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদের দেবতা হয় শ্যাম নয় শ্যামা। আমাদের হৃদয়মন্দিরে রজত-

গিরিসন্নিভ কিম্বা জবাকুসুমসঙ্কাশ দেবতার স্থান নেই ; আমরা শৈবও নই, সৌরও নই।

আমরা হয় বৈষ্ণব, নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির যা প্রভেদ, সেই পার্থক্য বিদ্যমান,—তবুও বর্ণসামান্যতার গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্ব্বিবাদে পাশা-পাশি অবস্থিতি করে। তবে বঙ্গ-সরস্বতীর দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ আমাদের চোখে যে পড়ে না, তার জন্য দোষী আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা। একালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানে আমাদের গুরুরা এবং গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের মন তার কায়িক এবং বাচিক সেবায়, দিন দিন নীরস ও নির্জ্জীব হ'য়ে পড়্ছে। আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিনে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমা-দের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু একজনকে আর-পাঁচ-জনের মত হ'তে বলে, ভুলেও কখনও আর-পাঁচজনকে এক-জনের মত হ'তে বলে না। সমাজের ধর্ম্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারি সাধন-পদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে 'অপরের মত হও' আর তার নিষেধ হচ্ছে 'নিজের মত হ'য়ো না।' এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম্ম এতই ভয়াবহ যে তার চাইতে পরধর্ম্মে নিধনও

শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট কর্‌তে সদাই উৎসুক। এর কারণও স্পষ্ট,—সবুজ রং, ভালমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। তাই আমাদের কর্ম্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা,—অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল,—আমাদের মনটিকে রাতারাতি পাকা করে' তুল্‌তে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে, কোনরূপ কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেল্‌তে পার্‌লেই—আমাদের মনের রং পেকে উঠ্‌বে। তাঁদের রাগ এই যে, সবুজ বর্ণমালার অন্তস্থ বর্ণ নয়, এবং ও রং কিছুরই অন্তে আসে না,—জীবনেরও নয়, বেদেরও নয়, কর্ম্মেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়। এঁদের চোখে সবুজ-মনের প্রধান দোষ যে, সে মন পূর্ব্বমীমাংসার অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে, এবং উত্তরমীমাংসার দেশে গিয়ে পৌঁছয় নি। এঁরা ভুলে' যান্ যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি,—প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপর দিকে এদেশের ভক্তিযোগীরা,—অর্থাৎ কবির দল,—কাঁচাকে কচি করতে চান। এঁরা চান যে আমরা শুধু গদগদ ভাবে আধ আধ কথা কই। এঁদের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এঁদের ইচ্ছা সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত করে' দিয়ে, ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনও আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হ'তে জানে না,—তার ধর্ম্ম হচ্ছে এগোনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্ম্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ

করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ কর্‌বেই,—কেবলমাত্র ভক্তির শান্ত-জলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে' রাখ্‌তে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙ্গালীর মন এখন অর্দ্ধেক অকাল-পক্ক, এবং অর্দ্ধেক অযথা-কচি। আমাদের আশা আছে যে, সবুজ ক্রমে পেকে লাল হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজরস কালকের লালরক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্ম্মের পরিচয় পাই, এবং প্রাণপণে তার চর্চ্চা করি। আমরা তাই দেশী কি বিলেতী পাথরে গড়া সরস্বতীর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, বাঙ্গলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে,' তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই ; কিন্তু এ মন্দিরের কোনও গর্ভ-মন্দির থাক্‌বে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই, আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হ'য়ে যায়। বন্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হ'য়ে যায়। আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাক্‌বে। ঊষার গোলাপী, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, বিরোধালঙ্কারস্বরূপে সবুজ পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হ'য়ে তার মরকতদ্যুতি কখনও উজ্জ্বল, কখনও কোমল করে' তুল্‌বে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।

বৈশাখ, ১৩২১

বীরবলের চিঠি

মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়,

'মানসী' সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু—

'মানসী' যে সম্পাদক-সঙ্ঘের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করে' অতঃপর রাজ-আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এতে আমি খুসি; কেননা, এ দেশে পুরাকালে কি হ'ত তা পুরাতত্ত্ববিদেরা বল্‌তে পারেন, কিন্তু একালে যে সব জিনিসই পঞ্চায়তের হাতে পঞ্চত্ব লাভ করে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

আমার খুসি হবার একটি বিশেষ কারণ এই যে—আমার জন্য 'মানসী' যা করেছেন, অন্য কোনও পত্রিকা তা করেন নি। অপরে আমার লেখা ছাপান, 'মানসী' আমার ছবিও ছাপিয়েছেন। লেখা নিজে লিখ্‌তে হয়, ছবি অন্যে তুলে' নেয়। প্রথমটির জন্য নিজের পরিশ্রম চাই, ছবি সম্বন্ধে কষ্ট অপরের,—যিনি আঁকেন ও যিনি দেখেন।

এই আপনি 'মানসী'র সম্পাদকীয় ভার নেওয়াতে আমি ষোল-আনা খুসি হতুম, যদি আপনি ছাপাবার জন্য আমার কাছে লেখা না চেয়ে আলেখ্য চাইতেন। এর কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। রাজাজ্ঞা সর্ব্বথা শিরোধার্য্য হ'লেও, সর্ব্বদা পালন করা সম্ভব নয়। রাজার আদেশে মুখ বন্ধ করা সহজ, খোলা

কঠিন।—পৃথিবীতে সাহিত্য কেন, সকল ক্ষেত্রেই নিষেধ মান্য করা বিধি অনুসরণ করার চাইতে অনেক সহজসাধ্য। 'এর ওর হাতে জল খেয়ো না',—এই নিষেধ প্রতিপালন করে'ই ব্রাহ্মণজাতি আজও টি'কে আছেন,—বেদ-অধ্যয়নের বিধি পালন কর্‌তে বাধ্য হ'লে কবে মারা যেতেন।

সে যাই হোক, একথা সত্য যে, আমার মত লেখকের সাহায্যে সাহিত্যজগতের কোন কাজ কিম্বা কাগজ সম্পাদন করা যায় না, কেননা আমি সরস্বতীর মন্দিরের পূজারি নই,—স্বেচ্ছা-সেবক। স্বেচ্ছা-সেবার যতই কেন গুণ থাকুক না, তার মহাদোষ এই যে, সে সেবার উপর বারো মাস নির্ভর করা চলে না। আর মাসিক পত্রিকা নামে মাসিক হ'লেও, আসলে বারোমেসে। তা ছাড়া পত্রের প্রত্যাশায় কেউ শিমূলগাছের কাছে ঘেঁসে না, এবং আমি যে সাহিত্য-উদ্যানের একটি শাল্মলী-তরু, তার প্রমাণ আমার গদ্যপদ্যেই পাওয়া যায়। লোকে বলে আমার লেখার গায়ে কাঁটা, আর মাথায় মধুহীন গন্ধহীন ফুল।

আর একটি কথা। সম্প্রতি কোনও বিশেষ কারণে প্রতিদিন আমার কাছে শ্রীপঞ্চমী হ'য়ে উঠেছে; মনে হয় কলম না ছোঁয়াটাই সরস্বতীপূজার প্রকৃষ্ট উপায়। এর কারণ নিম্নে বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা কর্‌ছি।

আপনি জানেন যে, লেখকমাত্রেরই একটি বিশেষ ধরণ আছে, সেই নিজস্ব ধরণে রচনা করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্য। পরের ঢঙের নকল করে শুধু সঙ। যা লিখতে আমি

আনন্দ লাভ করিনে,তা পড়্‌তে যে পাঠক আনন্দ লাভ কর্‌বেন —যে লেখায় আমার শিক্ষা নেই, সে লেখায় যে পাঠকের শিক্ষা হবে, এত বড় মিথ্যা কথাতে আমি বিশ্বাস করি নে। আমার দেহ মনের ভঙ্গীটি আমার চিরসঙ্গী—সেটিকে ত্যাগ করা অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। সমালোচকদের তাড়নায় লেখার ভঙ্গীটি ছাড়ার চাইতে লেখা ছাড়া ঢের সহজ,—অথচ সমালোচকদের মনোরঞ্জন কর্‌তে হ'লে, হয়ত আমার লেখার ঢঙ বদ্‌লাতে হবে।

আমার কলমের মুখে অক্ষরগুলো সহজেই একটু বাঁকা হ'য়ে বেরোয়। আমি সেগুলি সিধে কর্‌তে চেষ্টা না করে, যেদিকে তাদের সহজ গতি, সেই দিকেই ঝোঁক দিই। কিন্তু এর দরুণ আমার লেখা এত বঙ্কিম হ'য়ে উঠেছে যে, তা ফার্‌সি বলে' কারও ভ্রম হ'তে পারে,—এ সন্দেহ আমার মনে কখনও উদয় হয় নি। অথচ আমার বাঙ্গলা যে কারও কারও কাছে ফার্সি কিম্বা আরবি হ'য়ে উঠেছে, তার প্রমাণ 'মানসী'তেই পাওয়া যায়। আমি 'নোবেল প্রাইজ' নিয়ে যে একটু রসিকতা কর্‌বার প্রয়াস পেয়েছিলুম, 'মানসী'র সমালোচক তা তত্ত্বকথা হিসেবে অগ্রাহ্য করেছেন। যদি কেউ রসিকতাকে রসিকতা বলে' না বোঝেন, তাহ'লে আমি নিরুপায়; কারণ তর্ক করে' তা বোঝানো যায় না। যে কথা একবার জমিয়ে বলা গেছে, তার আর ফেনিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না।

এ অবস্থায় যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার

কপালে অরসিকে রস-নিবেদন 'মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ,' তা হ'লে সমালোচকেরাও আমাকে বলবেন, 'মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।' এঁদের উপদেশ অনুসারে রসিকতা করার অভ্যাসটা ত্যাগ কর্‌তে রাজি আছি, যদি কেউ আমাকে এ ভরসা দিতে পারেন যে, সত্য কথা বল্‌লে এঁরা তা রসিকতা মনে কর্‌বেন না। সে ভরসা কি আপনি দিতে পারেন ?

লোকে বলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য, হয় লোকের মনোরঞ্জন করা, নয় শিক্ষা দেওয়া। আমার বিশ্বাস সাহিত্যের উদ্দেশ্য দুই নয়,—এক। এক্ষেত্রে উপায়ে ও উদ্দেশ্যে কোনও প্রভেদ নেই। এই শিক্ষার কথাটাই ধরা যাক্। সাহিত্যের শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষা এক নয়। সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নয়,—বয়স্যের সম্বন্ধ। সুতরাং সাহিত্যে নিরানন্দ শিক্ষার স্থান নেই। অপর দিকে, যে কথার ভিতর সত্য নেই, তা ছেলের মন ভোলাতে পারে, কিন্তু মানুষের মনোরঞ্জন কর্‌তে পারে না।

রহস্য করে' যাঁদের মনোরঞ্জন কর্‌তে পারলুম না, স্পষ্ট কথা বলে' যে তাঁদের মনোরঞ্জন কর্‌তে পার্‌ব,—এ হচ্ছে আশা ছেড়ে আশা রাখা। আর কথায় যদি মানুষের মনই না পাওয়া যায়, তাহ'লে সে কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র। ভয় ত ঐখানেই।

সত্য কথা সুস্থ মনের পক্ষে আহার,—রুচিকরও বটে, পুষ্টিকরও বটে ; কিন্তু রুগ্ন মনের পক্ষে তা ঔষধ। তাতে উপকার যা' তা' পরে হবে, পেটে গেলে,—তাও আবার যদি

লাগে ;—কিন্তু গলাধঃকরণ কর্‌বার সময় তা কটুকষায়। বাঙ্গলার মনোরাজ্যেও ম্যালেরিয়া যে মোটেই নেই, এরূপ আমার ধারণা নয়। সুতরাং সাদা ভাবে সিধে কথা বল্‌তে আমি ভয় পাই।

রসিকতা ছাড়্‌লে আমাকে 'চিন্তাশীল' লেখক হ'তে হবে—অর্থাৎ অতি গম্ভীরভাবে অতি সাধুভাষায় বারবার হয়কে নয় এবং নয়কে হয় বল্‌তে হবে। কারণ, যা প্রত্যক্ষ তাকেই যদি সত্য বলি,—তাহ'লে আর গবেষণার কি পরিচয় দিলুম ? কিন্তু আমার পক্ষে ওরূপ করা সহজ নয়। ভগবান, আমার বিশ্বাস, মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখ্‌বার জন্য,—তাতে ঠুলি পর্‌বার জন্য নয়। সে ঠুলির নাম দর্শন দিলেও তা অগ্রাহ্য। শুন্‌তে পাই, চোখে ঠুলি না দিলে গরুতে ঘানি ঘোরায় না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে যাঁরা সংসারের ঘানি ঘোরাবার জন্য ব্যস্ত, লেখকেরা তাঁদের জন্য সাহিত্যের ঠুলি প্রস্তুত কর্‌তে পারেন—কিন্তু আমি তা পার্‌ব না। কেননা, আমিও ঘানিতে নিজেকেও যুতে দিতে চাইনে,—অপর কাউকেও নয়। আমি চাই অপরের চোখের সে ঠুলি খুলে দিতে ; শুধু শিং বাঁকানোর ভয়ে নিরস্ত হই। ফলে দাঁড়ালো এই যে, রসিকতা করা নিরাপদ নয়, আর সত্য কথা বলাতে বিপদ আছে।

দুটি একটি উদাহরণ দিলেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, আমি ঠিক কথা বল্‌ছি। বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে সমুদ্রযাত্রার পথে প্রতি-বন্ধক যে ধর্ম্ম নয় কিন্তু অর্থ, এ প্রত্যক্ষ সত্য ; কারণ তাঁদের কাছে ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, এবং অর্ণবযানেরা যে পথে

যাতায়াত করে—স এব পন্থা। অথচ এই কথা বল্‌তে গেলে, সমগ্র ব্রাহ্মণ-মহাসভা এসে আমার স্কন্ধে ভর করবেন।

স্নেহলতা যে-চিতায় নিজের দেহ ভস্মসাৎ করেছেন, সে-চিতার আগুনের আঁচ যে সমগ্র সমাজের গায়ে অল্পবিস্তর লেগেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কারণ কুমারীদাহ ব্যাপারটি এ দেশে নতুন, ও-উপলক্ষ্যে এখনও আমরা ঢাকঢোল বাজাতে শিখি নি। কিন্তু তাই বলে' যাঁদের দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত গাত্রজ্বালা হয়েছে, তাঁরাও যে সেই চিতাভস্ম গায়ে মেখে বিবাগী হ'য়ে যাবেন, এরূপ বিশ্বাস আমার নয়। যে আগুন আজ সমাজের মনে জ্বলে' উঠেছে, সে হচ্ছে খড়ের আগুন, দপ্‌ করে' জ্বলে' উঠে,' আবার অমনি নিভে যাবে। আজ ঝোঁকের মাথায় মনে মনে যিনি যতই কঠিন পণ করুন না কেন, তার একটিও টিক্‌বে না,—থাক্‌বে শুধু বরপণ। যতদিন সমাজ বাল্য-বিবাহকে বৈধ এবং অসবর্ণ-বিবাহকে নিষিদ্ধ বলে' মেনে নেবেন, ততদিন মানুষকে বাধ্য হ'য়ে বরপণ দিতেও হবে এবং নিতেও হবে। বিবাহাদি সম্বন্ধে অত সঙ্কীর্ণ জাতিধর্ম্ম রাখ্‌তে হ'লে ব্যক্তিগত অর্থ থাকা চাই। এ সত্য অঙ্ক কসে' প্রমাণ করা যায়। মূল কথা এই যে, সনাতন প্রথা বর্ত্তমানে সংসার-যাত্রার পক্ষে অচল। এবং অচলের চলন করতে গিয়েই আমাদের দুর্গতি। কিন্তু এই কথা বল্‌লে সমাজ হয় ত আমার জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করবেন।

মোদ্দা কথা এই যে, বাজে কথা শুন্‌লে লোকে মুখ অন্ধকার

করে ; এবং কাজের কথা শুনলে চোখ লাল করে। এ অবস্থায় 'বোবার শত্রু নেই' এই শাস্ত্রবচন অনুসারে চুপ করে' থাকাই শ্রেয়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে পুরাকালের অবস্থা এই একই রকমেরই ছিল, এবং সেই জন্যই সেকালে জ্ঞানীরা মুনি হ'তেন।

বৈশাখ, ১৩২১

"যৌবনে দাও রাজটীকা"

গত মাসের সবুজ পত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনও টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন :—

"যৌবনকে টীকা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য,—তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটীকা অর্থ—রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্ত্তাকর্ত্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টীকা—সেই টীকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।"

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে' মনে কর্‌তুম, যদি না আমার জানা থাক্‌ত যে, এদেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্ত-ঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল—দুই অসায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জুড়ীতে যুত্‌লে আর বাগ মানানো যায় না;—অতএব এদের প্রথমে পৃথক করে' পরে পরাজিত কর্‌তে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে;—অবশ্য তাই বলে' পৃথিবী তার আলিঙ্গন হ'তে মুক্তিলাভ কর্‌বার চেষ্টা করে না, এবং পোষমাসকেও বারোমাস পুষে' রাখে না। শীতকে

অতিক্রম করে' বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হ'লেও, তাকে শাসন কর্‌বার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা প্রকৃতির ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রবহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্‌তে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উল্টো টান টান্‌তে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হ'তে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দু'য়ের আবির্ভাব যে একই দৈবী-শক্তির লীলা—এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ কর্‌তে পারে।

এদেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটীকার পরিবর্ত্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ কর্‌তে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া—কোনরকমে সেটি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হ'তে বার্দ্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপরপক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই; বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে, দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই

আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এদেশে রাজ-নীতির ক্ষেত্রে এক দিকে বালক, অপর দিকে বৃদ্ধ ; সাহিত্য-ক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপর দিকে স্কুলমাষ্টার ; সমাজে এক দিকে বাল্যবিবাহ, অপর দিকে অকালমৃত্যু ; ধর্ম্মক্ষেত্রে এক দিকে শুধু 'ইতি' 'ইতি', অপর দিকে শুধু 'নেতি' 'নেতি' ;—অর্থাৎ একদিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপর দিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে ;—ভিতরে কিছু নেই ; এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে ; কিন্তু তারি অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে অন্ত আছে ;—শুধু মধ্য নেই।

বার্দ্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেল্‌লেও, আমরা তার মিলন সাধন কর্‌তে পারি নি ; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তা ছাড়া যা আছে,—তা নেই বল্‌লেও, তার অস্তিত্ব লোপ হ'য়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বল্‌লেও তা অস্পৃশ্য হ'য়ে যায় না; এবং আত্মাকে ছায়া বল্‌লেও তা অদৃশ্য হ'য়ে যায় না। বরং কোনও কোনও সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে' বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিইনি তা, এখন নানা

বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে' রয়েছে। যাঁরা সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হ'য়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে' রাখ্‌লে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায়, এবং সেই জন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে যৌবনকে গোপন করে' রাখ্‌তে চাই,—তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনও বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life ;—ইংরেজি সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হ'তে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্য্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য, এবং সে দেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে' উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ, মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত—এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ, ও মাল্য-চন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিম্বা দ্রষ্টা কবিদের মতে, প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগানো, এবং পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগানো। হিন্দুযুগের শেষ কবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা

বলেছেন। সে কথা এই যে—'যদি বিলাস-কলায় কুতূহলী হও ত আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো।' এক কথায়, যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করে-ছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলবাস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের, আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান গৌতম-বুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহ নাশ করে' তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ করে', পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়ন-কথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয়নি, তা নয়;—তবে ললিতবিস্তরকে আর কেউ কাব্য বলে' স্বীকার করবেন না; এবং অশ্বঘোষের নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত হ'য়ে গেছে। অপর দিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে' যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন,—যথা, ভাস, গুণাঢ্য, সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি,—তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্দ্ধেক বাদ পড়ে' যায়।

"যৌবনে দাও রাজটীকা"

কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন-কথা শুন্‌তে ও বল্‌তে ভালবাস্‌তেন; কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল, এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্দ্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনের ফলে—রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়ন-ধর্ম্মের অনুশীলন করে' রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করে-ছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরই ধর্ম্ম। বার্দ্ধক্য কিছু অর্জ্জন কর্‌তে পারে না বলে' কিছু বর্জ্জনও কর্‌তে পারে না। বার্দ্ধক্য কিছু কাড়্‌তে পারে না বলে', কিছু ছাড়্‌তেও পারে না;—দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশকোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে', এখানে আমি একটি কথা বলে' রাখ্‌তে চাই। কেউ মনে কর্‌বেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃত কাব্য 'বয়কট' কর্‌তে বল্‌ছি, কিম্বা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ কর্‌বার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে, যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয়, এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে-যৌবনধর্ম্মের বর্ণনা আছে, তা যে সামান্য মানব-ধর্ম্ম—এ হচ্ছে

অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল—তাও অস্বীকার করবার জো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি—ভাষায় যাকে বলে এক-রোখামি ও বাড়াবাড়ি,—তাই হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূলশরীরকে অত আস্কারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হ'য়ে ওঠে, এবং সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হ'তে এত সূক্ষ্মতম হ'য়ে ওঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময়, কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হ'লে, সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে, মন পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক হ'য়ে যায়, এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানী করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক্, প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার প্রমাণ—প্রাচীন সমাজের এক দিকে বিলাসী, অপর দিকে সন্ন্যাসী; এক দিকে পত্তন, অপর দিকে বন; এক দিকে রঙ্গালয়, অপর দিকে হিমালয়;—এক কথায় এক দিকে কামশাস্ত্র, অপর দিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু, জীবনে থাক্‌তে পার্‌ত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এই দুই

বিরুদ্ধ মনোভাবের পরস্পর মিলনের যে কোনও পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

'একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা !'

এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যাঁরা দরী-প্রাণ, তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক,—যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ, তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দার, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁঝ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাস-বশতঃ কথায় ও কাজে বেশী অসংযত।

যাঁরা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন, তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ—এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন, রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি Solomon. চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ কর্‌তে না পেরে, এঁরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসেবে ব্যবহার করেন, তাঁরা, শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন, এবং তাকে পদদলিত কর্‌তেও সঙ্কুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চ্চা কর্‌লে, শেষবয়সে জীবন তিতো হ'য়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাক্‌বারই কথা।

যাঁরা যৌবন-জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাঁটার সময় পাঁকে পড়ে' গত-জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে' গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে' যৌবন ফিরে না পেতেন তাহ'লে তিনি যে কাব্য কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করতেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাকত—তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল, তা বলতে পারিনে,—কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে; কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক, সকলেই এক-মত।

'যৌবন ক্ষণস্থায়ী'—এই আক্ষেপে এদেশের কাব্য ও সঙ্গীত পরিপূর্ণ।

'ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়
গয়ে রে যোবন, ফিরি আওত নাহি।'

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে ঘাটে অতি করুণ স্বরে গাওয়া হ'য়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপশোষ রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী, তার স্থায়িত্ব বাড়াবার

চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নিজের অধিকার বিস্তার কর্‌বার উদ্দেশ্যেই, এদেশে যৌবন শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্যবিবাহের মূলে হয় ত এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্ত্তমান। জীবনের গতিটা উল্টো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপর সব দেশে, লোকে গাছকে কি করে' বড় কর্‌তে হয় তারই সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে' ছোট কর্‌তে হয়, সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতর পুরে' রেখে' দিতে পারে। শুন্‌তে পাই, এই সব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয় বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব কর্‌লে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চ্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে, এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই, অপর সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিঁকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে', মানব-সমাজটাকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ কিছু অহঙ্কার কর্‌বার আছে, তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক্, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন—ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হ'লেও মানব-সমাজের হিসেবে ও দুই পদার্থ নিত্য বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হ'লেও না হ'তে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে, তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

এ বিচার কর্‌বার সময়, এ কথাটী মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি,—যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হ'য়ে ওঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হ'লেও, দেহমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে, মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাক্‌লেও, দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ কর্‌তে পার্‌লেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌ব। দেহ সঙ্কীর্ণ ও পরিচ্ছন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন, অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই;—কিন্তু একের মনের যৌবন, লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে' দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ব্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণ-শক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা কর্‌ছে। প্রাণের

"যৌবনে দাও রাজটীকা"

পায়ের নীচে হচ্ছে জড়জগৎ, আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম্ম যে, জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নব নব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা,—এটি সর্ব্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর একটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু-দর্শনের মতে, জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা—দুই-ই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হ'য়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হ'য়ে যায়; আর উন্নত হ'য়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে' নেয়;—বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হ'য়ে পড়ে। যেমন প্রাণী-জগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে-সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই; তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে-সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁক্‌ড়ে থাকাই বার্দ্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণ-শক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হ'তে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখ্‌লেও, আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী কর্‌তে হ'লে,—শৈশব নয়, বার্দ্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার কর্‌তে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে, বার্দ্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার কর্‌বার শক্তি আমরা সমাজ হ'তেই সংগ্রহ কর্‌তে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে' গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ কর্‌ছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন নিত্য জন্মলাভ কর্‌ছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন চিন্তা, নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পার্‌বেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পার্‌বেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটীকা দিতে আপত্তি কর্‌বেন,—এক জড়বাদী, আর এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই একমত। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হ'তে তার অস্থির প্রাণটুকু বা'র করে' দিয়ে,

"যৌবনে দাও রাজটীকা"

যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল, আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক,—প্রভেদ যা, তা নামে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

ইতিমধ্যে

সম্পাদক মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে লেখকদের—'ইতিমধ্যে' একটা কিছু লিখে দিতে আদেশ করেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কি লিখ্‌ব ?—তার উত্তরে বলেন, যাহোক্ একটা কিছু লেখো, কি যে লেখো তাতে কিছু আসে যায় না—কিন্তু আসল কথা হচ্ছে লেখাটা 'ইতিমধ্যে' হওয়া চাই। এস্থলে ইতিমধ্যের অর্থ হচ্ছে—আগামী সংখ্যার কাগজ বেরবার পূর্ব্বে। সম্পাদক মহাশয়েরা যখন আমাদের এইভাবে সাহিত্যের মাস্‌কাবার তৈরি কর্‌তে আদেশ দেন, তখন তাঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্যে যারা পাকা, অঙ্কে তারা স্বভাবতঃই কাঁচা।

দিন গুণে কাজ কর্‌বার প্রবৃত্তিটি আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি।—কোন্ দিনে কোন্ ক্ষণে কোন্ কার্য্য আরম্ভ কর্‌তে হবে, সে বিষয়ে এদেশে খুব বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল—কিন্তু আরব্ধ কর্ম্ম কখন যে শেষ কর্‌তে হবে, সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। সেকালে কোনও জিনিস যে তামাদি হ'ত, তার প্রমাণ সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। সেই কারণেই বোধ হয়, বহু মনোভাব ও আচারব্যবহার, যা' বহুকাল পূর্ব্বে তামাদি হওয়া উচিত ছিল, হিন্দু-সমাজের উপর আজও তাদের দাবী পুরোমাত্রায় রয়েছে। সে যাই হোক্, কাজের ওজনের সঙ্গে

সময়ের মাপের যে একটা সম্বন্ধ থাকা উচিত—এ জ্ঞান আমাদের ছিল না। 'কালোহ্যয়ং নিরবধি'—একথা সত্য হ'লেও—সেই কালকে মানুষের কর্ম্মজীবনের উপযোগী করে' নিতে হ'লে, তার যে ঘর কেটে নেওয়া আবশ্যক,—এই সহজ সত্যটি আমরা আবিষ্কার কর্‌তে পারিনি। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর বিশেষ কাজ শেষ কর্‌তে হ'লে, প্রথমে কোথায় দাঁড়ি টান্‌তে হবে, সেটি জানা চাই; তারপরে কোথায় কমা ও কোথায় সেমিকোলন দিতে হবে, তারও হিসেব থাকা চাই। এক কথায়, সময় পদার্থটিকে punctuate কর্‌তে না শিখলে punctual হওয়া যায় না। সুতরাং আমরাও যে, ইংরেজদের মত, সময়কে টুক্‌রো করে' নিতে শিখ্‌ছি,—তা'তে কাজের বিশেষ সুবিধে হবে; কিন্তু সাহিত্যের সুবিধে হবে কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ সময়ের মূল্যের জ্ঞান বড় বেশী বেড়ে গেলে, সেই সময়ে যা' করা যায়, তার মূল্যের জ্ঞান চাই-কি আমাদের কমেও যেতে পারে। জর্ম্মান কবি গেটে বলেছেন যে, মানুষের চরিত্র গঠিত হয় কর্ম্মের ভিতর, আর মন গঠিত হয় অবসরের ভিতর। অর্থাৎ পেশি সবল কর্‌তে হ'লে, মানুষের পক্ষে ছুটোছুটি করা দরকার,—কিন্তু মস্তিষ্ক সবল কর্‌তে হ'লে, মাথা ঠিক রাখা দরকার, স্থির থাকা দরকার। সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে মস্তিষ্কের কাজ, সুতরাং 'ইতিমধ্যে' বল্‌তে যে অবসর বোঝায়, তার ভিতর সে রচনা করা সম্ভব কি না—তা আপনারাই বিবেচনা কর্‌বেন। তবে যদি কেউ

বলেন যে, লেখার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধ থাকাই চাই,' এমন কোনও নিয়ম নেই,—তাহ'লে অবশ্য গেটের মতের মূল্য অনেকটা কমে' আসে।

হাজার তাড়াহুড়ো কর্‌লেও লেখা জিনিসটা কিঞ্চিৎ সময় সাপেক্ষ, তার প্রমাণ উদাহরণের সাহায্যে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে কবিতার কথা ধরা যাক্। লোকের বিশ্বাস যে কবিতার জন্মস্থান হচ্ছে কবির হৃৎপিণ্ড। তাহ'লেও হৃদয়ের সঙ্গে কলমের এমন কোন টেলিফোনের যোগাযোগ নেই, যার দরুণ হৃদয়ের তারে কোনও কথা ধ্বনিত হবামাত্র কলমের মুখে তা প্রতিধ্বনিত হবে। আমার বিশ্বাস যে, যে-ভাব হৃদয়ে ফোটে তাকে মস্তিষ্কের বকযন্ত্রে না চুঁইয়ে নিলে, কলমের মুখ দিয়ে তা ফোঁটা ফোঁটা হ'য়ে পড়ে না। কলমের মুখ দিয়ে অনায়াসে মুক্ত হয় শুধু কালি,—সাত রাজার ধন কালো মাণিক নয়। অতএব কবিতা রচনা কর্‌তেও সময় চাই।—তারপর ছোট গল্প। মাসিকপত্রের উপযোগী গল্প লিখ্‌তে হ'লে, প্রথমে কোনও না কোনও ইংরেজি বই কিম্বা মাসিকপত্র পড়া চাই। তারপর সেই পঠিত গল্পকে বাংলায় গঠিত কর্‌তে হ'লে, তাকে রূপান্তরিত ও ভাষান্তরিত করা চাই। এর জন্যে বোধ হয় মূলগল্প লিখ্‌বার চাইতেও বেশী সময়ের আবশ্যক।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে যা'খুসি-তাই লিখ্‌বার একটা সুবিধে ছিল। 'একালে এদেশে কিছুই নেই, অতএব সেকালে এদেশে সব ছিল' এই কথাটা নানারকম ভাষায়

ফলিয়ে ফেনিয়ে লিখ্‌লে সমাজে তা' ইতিহাস বলে' গ্রাহ্য হ'ত। কিন্তু সে সুযোগ আমরা হারিয়েছি। একালে ইতিহাস কিম্বা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখ্‌তে হ'লে, তার জন্য এক লাইব্রেরি বই পড়াও যথেষ্ট নয়। প্রত্নতত্ত্ব এখন মাটি খুঁড়ে' বা'র কর্‌তে হয়, সুতরাং 'ইতিমধ্যে' অর্থাৎ সম্পাদকীয় আদেশের তারিখ এবং সাম্‌নে মাসের পয়লার মধ্যে—সে কাজ করা যায় না। অবশ্য ম্যালেরিয়ার বিষয় কিছুই না-জেনে অনেক কথা লেখা যায়, কিন্তু সে লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যার একপাশে ভ্রমর-গুঞ্জন আর অপর পাশে মধু,—তাই আমরা সাহিত্য বলে' স্বীকার করি। দুঃখের বিষয় ম্যালেরিয়ার এক পাশে মশক-গুঞ্জন—আর অপরপাশে কুইনীন। সুতরাং সাহিত্যেও ম্যালেরিয়া হ'তে দূরে থাকাই শ্রেয়। বিনা চিন্তায়, বিনা পরিশ্রমে, আজকাল শুধু দুটি বিষয়ের আলোচনা করা চলে। এক হচ্ছে উন্নতিশীল রাজনীতি, আর এক হচ্ছে স্থিতিশীল সমাজনীতি। কিন্তু এ দুটি বিষয়ের আলোচনা সচরাচর সভাসমিতিতেই হ'য়ে থাকে। অতএব ও দুই হচ্ছে বক্তাদের একচেটে। লেখকেরা যদি বক্তাদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেন, তাহ'লে বক্তারাও লিখ্‌তে সুরু কর্‌বেন,—এবং সেটা উচিত কাজ হবে না।

লিখ্‌বার নানারূপ বিষয় এইভাবে ক্রমে বাদ পড়ে' গেলে, শেষে একটিমাত্র জিনিসে গিয়ে ঠেকে, যার বিষয় নির্ভাবনায় অনর্গল লেখনী চালনা করা চলে,—এবং সে হচ্ছে নীতি।

বীরবলের হালখাতা

নীতির মোটা আদেশ ও উপদেশগুলি সংখ্যায় এত কম যে, তা আঙ্গুলে গোণা যায়,—এবং সেগুলি এতই সর্ব্বলোকবিদিত ও সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সুস্থশরীরে স্বচ্ছন্দচিত্তে সে বিষয়ে এক গঙ্গা লিখে যাওয়া যায়, কেননা কেউ যে তার প্রতিবাদ করবে, সে ভয় নেই।

মানুষ যে দেবতা নয়, এবং মানবের পক্ষে দেবত্ব লাভের চেষ্টা নিত্য ব্যর্থ হ'লেও যে নিয়ত কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তবুও অপরকে নীতির উপদেশ দিতে আমার তাদৃশ উৎসাহ হয় না। তার কারণ, মানুষ খারাপ বলে' আমি দুঃখ করিনে,—কিন্তু মানুষ দুঃখী বলে' মন খারাপ করি। অথচ মানুষের দুর্গতির চাইতে দুর্নীতিটি চোখে না পড়্‌লে নীতির গুরুগিরি করা চলে না।

তা ছাড়া পরের কানে নীতির মন্ত্র দেওয়া সম্বন্ধে আমার মনে একটি সহজ অপ্রবৃত্তি আছে। যে কথা সকলে জানে, সে কথা যে আমি না বল্‌লে দেশের দৈন্য ঘুচ্‌বে না, এমন বিশ্বাস আমি মনে পোষণ করতে পারিনে। এমন কি আমার এ সন্দেহও আছে যে, যাঁরা দিন নেই রাত নেই অপরকে লক্ষ্মী-ছেলে হ'তে বলেন, তাঁরা নিজে চান শুধু লক্ষ্মীমন্ত হ'তে। যাঁরা পরকে বলেন 'তোমরা ভাল হও, ভাল কর,' তাঁরা নিজেকে বলেন 'ভাল খাও, ভাল পর।' সুতরাং আমার পরামর্শ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তাহ'লে আমি তাঁকে বলব 'ভাল খাও, ভাল পর।' কারণ মানুষ পৃথিবীতে কেন আসে কেন যায়, সে

রহস্য আমরা না জান্‌লেও, এটি জানি যে 'ইতিমধ্যে' তার পক্ষে খাওয়া পরাটা দরকার।

'তোমরা ভাল খাও, ভাল পর,' এ পরামর্শ সমাজকে দিতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন, কেননা ও-কথার ভিতর এই কথাটি উহ্য থেকে যায় যে, পরামর্শদাতাকে নিজে ভাল হ'তে হবে এবং ভাল করতে হবে। আপত্তি ত ঐখানেই।

যিনি ভাল খান ও ভাল পরেন, সহজেই তাঁর মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিশ্বাস জন্মে যায়, এবং সেই সঙ্গে এই ধারণাও তাঁর মনে দৃঢ় হ'য়ে ওঠে যে, যেখানে দৈন্য সেইখানেই পাপ।

দারিদ্র্যের মূল যে দরিদ্রের দুর্নীতি, এই ধারণা এক সময়ে ইউরোপের ধনী লোকের মনে এমনি বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছিল যে, এই ভুলের উপর 'পলিটিক্যাল্‌ ইকনমি' নামে একটি উপ-বিজ্ঞান বেজায় মাথা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। অর্থ যে ধর্ম্মমূলক, এর প্রমাণ পৃথিবীতে এতই কম যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একটি পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করে', সেই পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ, সমাজকে মেনে নিতে শিখিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যার চাতুর্য্যে জিৎ অবশ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদেরই, কারণ বহু লোকের দুঃখ কষ্ট যে তাদের ইহজন্মের কর্ম্মফলে নয়, তা প্রমাণ করা যেতে পারে; কিন্তু সে যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে নয়, তা এ জন্মে অপ্রমাণ করা যেতে পারে না।

আসলে দুজনার মুখে একই কথা। সে হচ্ছে এই যে, পরের দুঃখ যখন তাদের নিজের দোষে, তখন তাদের শুধু ভাল হ'তে

শেখাও,—তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। অতএব মানুষের দুর্গতির প্রতি করুণ হওয়া উচিত নয়, তাদের দুর্নীতির প্রতি কঠোর হওয়াই কর্ত্তব্য।

কিন্তু আজকাল কালের গুণে, শিক্ষার গুণে, আমরা পরের দুঃখ সম্বন্ধে অতটা উদাসীন হ'তে পারিনে, কর্ম্মফলে আস্থা রেখে' নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারিনে। তাই দীনকে নীতিকথা শোনানো অনেকে হীনতার পরিচায়ক মনে করেন। ছোট ছেলে সম্বন্ধে 'পড়্‌লে শুন্‌লে দুধু ভাতু', এ সত্যের পরিবর্ত্তে—'আগে দুধ ভাত, পরে পড়াশুনো,' এই সত্যের প্রচার করৃতে চাই। এদেশের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের জন্য আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করৃবার পূর্ব্বে, অন্নের ব্যবস্থা করা শ্রেয় মনে করি। আগে অন্নপ্রাশন, পরে বিদ্যারম্ভ,—সংস্কারেরও এই সনাতন ব্যবস্থা বজায় রাখা আমাদের মধ্যে সঙ্গত। অথচ আমরা যে কেন ঠিক উল্টো পদ্ধতির পক্ষপাতী, তার অবশ্য কারণ আছে।

লোক-শিক্ষার নামে যে আমরা উত্তেজিত হ'য়ে উঠি, তার প্রথম কারণ আমরা শিক্ষিত। স্কুলে লিখে এসে যে কালি আমরা হাত আর মুখে মেখেছি, তার ভাগ আমরা দেশসুদ্ধ লোককে দিতে চাই। যেমনি একজনে লোক-শিক্ষার সুর ধরেন, অমনি আমরা যে তার ধুয়ো ধরি, তার আর একটি কারণ এই যে, এ কাজে আমাদের শুধু বাক্যব্যয় করৃতে হয়, অর্থব্যয় করৃতে হয় না। এ ব্যাপারে লাগে লাখ টাকা, দেবে গৌর-সরকার।

জনসাধারণের হাতেখড়ি দেবার পরিবর্ত্তে মুখে ভাত দেবার প্রস্তাবে আমরা যে তেমন গা করিনে, তার কারণ সাংসারিক হিসেবে সকলের স্বার্থসাধন করতে গেলে, নিজের স্বার্থ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা চাই; ত্যাগস্বীকারের জন্য নীতি নিজে শেখা দরকার পরকে শেখানো দরকার নয়।

আমাদের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ যে সমগ্র জাতির স্বার্থের সহিত জড়িত, এ জ্ঞান যে আমাদের হয়েছে, তার প্রমাণ বাঙ্গলা-সাহিত্যের কতকগুলি নতুন কথায় পাওয়া যায়। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের কথা, জাতীয় আত্ম-জ্ঞানের কথা, আজ-কাল বক্তাদের ও লেখকদের প্রধান সম্বল। অথচ এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, এত বলা কওয়া সত্ত্বেও, এই অঙ্গাঙ্গীভাব পরস্পরের গলাগলিভাবে পরিণত হয়নি; আর জাতীয় আত্মজ্ঞান শুধু জাতীয় অহঙ্কারে পরিণত হচ্ছে, যদিচ অহংজ্ঞানই আত্মজ্ঞানের প্রধান শত্রু। জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনেকের মনে জাগ্রত হ'লেও, জাতীয় কর্ত্তব্য যে সকলে করেন না, তার কারণ, পরের জন্য কিছু করবার দিন আমরা নিত্যই পিছিয়ে দিই। আমাদের অনেকের চেষ্টা হচ্ছে প্রথমে নিজের জন্য সব করা, পরে অপরের জন্য কিছু করা। সুতরাং জাতীয় কর্ত্তব্যটুকু আর 'ইতিমধ্যে' করা হয় না। ফলে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম,' এই পুরোনো কথার উপর আমরা নিজের কর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠা করি, আর 'জাত বাঁচলে ছেলের নাম,' এই রকম কোন একটা বিশ্বাসের বলে, জাতীয় কর্ত্তব্যের ভারটা

—এখন যারা ছেলে এবং পরে যারা মানুষ হবে. তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, যা কিছু করতে হবে, তা 'ইতিমধ্যেই' করতে হবে। সম্পাদক মহাশয়েরা, লেখক ও পাঠকদের যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করাতে পারেন, তাহলে তাঁদের সকল আজ্ঞা আমরা পালন করতে প্রস্তুত আছি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১